বিবেকানন্দের বিপ্লবচিন্তা

মিত্র কৌটিল্য

সুজন পাবলিকেশনস
কলিকাতা-৭০০০২৯

স্বাধীনতা যুদ্ধে নিবেদিত প্রাণ
শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে ও শহীদ ক্ষুদিরামের
অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রকাশকের নিবেদন

সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনীষী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক, গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এর আগে প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক মিত্র কৌটিল্যের বিবেকানন্দের বিপ্লবচিন্তা একটি প্রামাণ্য রচনা বলে আমার মনে হয়েছে এবং একজন গঠনমূলক প্রকাশক হিসাবে এই বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও ধর্মচিন্তা নিয়ে বহু বই বেরিয়েছে, আরো বেরুবে। কিন্তু সমাজবিপ্লব তথা রাষ্ট্র-সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা এক সূত্রে গ্রথিত হয়নি তেমন। এই দিকটা বিচার করেই আমরা গ্রন্থটি প্রকাশে উদ্যোগী হই। কারণ আমাদের দৃঢ় ধারণা, বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে সিরিয়স পাঠক পাঠিকার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থ তাদের সমাদর ও স্বীকৃতি পেয়েছে, সেজন্য প্রকাশক হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ ত্বরান্বিত করতে বাধ্য হয়েছি সুধী পাঠকদের উৎসাহে ও দাবিতে। প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ার পর বহু বন্ধুপাঠক বইটি শীঘ্র পুনঃপ্রকাশের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন আমাদের। তাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতাই আমাদের মূলধন।

সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং যুব সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্যকে লেখক সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামীজীর মূলমন্ত্রের সাথে বিশিষ্ট তাত্ত্বিক—মার্কস, গান্ধী, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তাধারার সবিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। আমার ধারণা, বইটি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র, শিক্ষক রাজনীতিবীদ, সাংবাদিক, সাধারণ পাঠক পাঠিকার সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হবে।

লেখক মিত্র কৌটিল্য ছাড়াও ডঃ সজল বসুর কাছে আমি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ এই বইটি প্রকাশনার কাজে সাহায্য করার জন্য।

তপন মুখোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি ঐ যুগে নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই সাথেই তিনি বলেছিলেন, "আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী তার মানে এই নয় যে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, এর কারণ উপোষ করার চেয়ে আধপেটা খাওয়া ভাল।" অর্থাৎ সমাজতন্ত্রও যে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। কোন কোন লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, জনসাধারণের উন্নতির জন্য স্বামীজী যে পথের কথা বলেছিলেন, তার পেছনে মার্কস ও ক্রপটকিনের প্রভাব ছিল। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় কাগজে মার্কসের নামোল্লেখ, যতদূর জানা যায় প্রথম ঘটেছিল ১৮৯০ সালে থিওজফিস্ট পত্রিকায়। স্বামীজী তখন ভারত প্রব্রজ্যায় রত। ১৮৯৩-৯৫ সালেও দু-তিনবার এই নামটির উল্লেখ দেখা যায় ভারতীয় কাগজে, কিন্তু ততদিনে স্বামীজী পাশ্চাত্যে চলে গেছেন। আর ক্রপটকিনের সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল ১৯০০ সালের আগষ্ট মাসে প্যারিসে। দীর্ঘ ভারত-প্রব্রজ্যার সময় যে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তার সাহায্যেই তিনি নিজস্ব বক্তব্য গড়ে তোলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত জীবন-জিজ্ঞাসার সাহায্যে। শিকাগো ধর্মসভায় অবতীর্ণ হবার আগেই মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গাকে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"নৃশংস সমাজ ভারতীয় গরীবদের ওপর যে ক্রমাগত আঘাত করছে তার যন্ত্রণা তারা পাচ্ছে, কিন্তু ঐ গরীবেরা জানেনা কোথা থেকে ঐ মার আসছে।" বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, তিনি ভারতীয় গরীবদের সচেতন করতে চেয়েছেন 'কোথা থেকে ঐ মার আসছে' সে বিষয়ে। ঐ চিঠিতেই তিনি লিখেছিলেন উচ্চপদস্থ ও ধনীদের ওপর ভরসা না করতে, 'ভরসা পদমর্যাদাহীন বিশ্বাসী দরিদ্রদেরই ওপর।' ১৮৯৬ সালে ভারতে ফিরে এলেন তিনি, কলম্বো থেকে লাহোর পর্যন্ত অনেকগুলি বক্তৃতায় নিজস্ব মত ও পথ ঘোষণা করলেন উচ্চকণ্ঠে: "আসল কথা জনগণের সাহায্যেই জনগণের মুক্তি ঘটাতে হবে।" ঐসব বক্তৃতায় তিনি সোস্যালিজম, মূলধন ও শ্রমের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, পাশ্চাত্য সমাজে এগুলির

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েও মন্তব্য করেছেন। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণে ক্রপটকিনের সাথে অনেক কথা হয়েছিল, স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে আসতেন কমিউনিস্টরাও (এ-কথা তাঁর লেখাতেই জানা যায়)। কিন্তু স্বামীজীর ধ্যান-ধারণার মধ্যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। বিশেষত তৎকালীন ন্যাশনাল কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা করে বলেছিলেন, "কংগ্রেস গরীবদের জন্য কি করছে?" "বণিকের রাজত্বে গরীবের ভিক্ষাপাত্রের কোনও দাম নেই।" বিশেষ করে স্বামীজী যখন (১৯০১ সালে ঢাকা শহরে) বলেছিলেন, "আমি বলছি শোন—শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে-রাশিয়ায় এবং পরে চীনে" তখন নিশ্চয়ই ইতিহাস-সচেতন মানুষের কাছে তা চমক লাগায়! এমন আশাবাদী মার্কস্ কিংবা এঙ্গেল্‌স্‌ও ছিলেন না, লেনিন তখনও পথ খোঁজায় ব্যস্ত, আর মাওসেতুং তো তখন শিশুমাত্র।

ছাত্র জীবনে যখন মার্কসবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম তখন থেকেই আমার জিজ্ঞাসা নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। মার্কসবাদী সাহিত্যে অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছিলাম। মনে জেগেছিল আরও সব সাহসী প্রশ্ন। বলাই বাহুল্য, সে-সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি ঐ সাহিত্যে। তাছাড়া, মার্কসবাদী অর্থনৈতিক আলোচনা আমার মনে যতটা সাড়া জাগিয়েছিল, ইতিহাস ও দর্শন (ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম) ততটা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। এ-সময়ে হঠাৎ হাতে এল ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বইটি। নিরুত্তর প্রশ্নগুলি নতুন দিগন্ত দেখতে পেয়ে ক্রমশঃ উন্মোচিত হতে লাগল। চোখে পড়ল স্বামীজীর কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক উক্তি—রাশিয়া-চীনেই প্রথম শূদ্র-অভ্যুত্থান ঘটবে, ইওরোপ আমেরিকায় ৫০ বছরের মধ্যেই দুটি বিরাট যুদ্ধ বাঁধবে, আগামী পৃথিবীতে হুন ও নিগ্রো এই দুইটি বিশাল শক্তির উদয় হবে, স্বাধীনতার পর চীনের দিক থেকে ভারতের বিপদ আসবে, ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বকে ভারত নতুন পথ দেখাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যে স্বামীজী হাত-দেখা জ্যোতিষচর্চাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন, তিনি কিভাবে এই নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণীগুলি করলেন? নিশ্চয়ই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি নতুন কোন সূত্র দেখতে পেয়েছিলেন। স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে ডুব দিলাম। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হল নতুন দিগন্ত, মননে বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক চেতনায় যা

সমুজ্জল। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম, ধর্মে আস্থা ছিল না, আর সমাজবিদ্যা ছিল আমার প্রিয় বিষয়। কিন্তু স্বামীজীর বইয়ে পেলাম এমন এক ধর্ম যা নাস্তিকের কাছেও গ্রহণযোগ্য ; দর্শন আর বিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়িয়েছে তখন। আমার চেতনায় গভীর রূপান্তর ঘটে গেল। এতে আরও ইন্ধন জোগাল হাক্সলী, সার্ত্রে, রাসেল, মারকিউজ, কৃষ্ণমূর্তির বই-গুলি। পরিচয় ঘটল রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের সাথে। জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র জগতে দুর্লভ। সেই থেকে নানান বিষয়ের ওপর লিখছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। 'লিখছি' কথাটি ঠিক নয়, আসলে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি। নিঃসঙ্গ মানুষের অন্তহীন জিজ্ঞাসা এখনও আমার সত্তাকে তন্নিবিষ্ট করে রেখেছে। এমন সময়ে এগিয়ে এলেন তরুণ প্রকাশক তপন মুখোপাধ্যায় ও গবেষক-বন্ধু ডঃ সজল বসু। বিভিন্ন পত্রিকার ছড়ানো প্রবন্ধগুলিকে বইয়ের আকারে প্রকাশের দায়িত্ব নিলেন। বইয়ের নাম 'বিবেকানন্দের বিপ্লবচিন্তা'। বিবেকানন্দকে পুরোপুরি চিনেছি এই দাবী করিনা। বরং বলা যায়, আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বিবেকানন্দের মধ্যে যেমন পেয়েছি তা-ই লিখেছি। এ আমারই ব্যাখ্যা স্বামীজী সম্পর্কে। তাঁর সম্বন্ধে আমার এই মূল্যায়নে অসম্পূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া, মানুষের চেতনারও ত পরিবর্তন ঘটে! ভবিষ্যতে স্বামীজীর চিন্তায় নতুন আলো পাব—এমন কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

স্বামীজীর বিপ্লবচিন্তা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চারটি প্রধান সমস্যার মুখোমুখি হই। প্রথমত, তাঁর বিভিন্ন বই বক্তৃতা-পত্রাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে থাকা উক্তিগুলির সংকলন। দ্বিতীয়ত, তাঁর মূল সমাজদর্শনের মধ্যে এই উক্তিগুলি যথার্থভাবে প্রতিস্থাপন। তৃতীয়ত, তাঁর কোন কোন মন্তব্যের অভিভাব (Suggestion) আশ্রয় করে তার বিস্তৃতি ঘটানো। এবং চতুর্থত, তাঁর মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণে যথেষ্ট পরিমাণে ঐতিহাসিক নিদর্শন উপস্থাপিত করা। আমার সাধ্যানুসারে এর সমাধান করার চেষ্টা করেছি এ-বইয়ে।

ব্যক্তিত্বের বিনাশ নয়, বরং ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্যই মানুষ প্রথমে সুনির্দিষ্ট সমাজ ও পরে রাষ্ট্রের উদ্ভাবন করেছিল। অথচ সেই সমাজ ও

রাষ্ট্রই মানুষের আত্মপ্রকাশের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষকে অর্থনৈতিক জীব বলে ভাবা এবং পরিচালন-ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয়র কর্তৃত্বই রয়েছে এর মূলে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা হয়েছে **মানুষ-সমাজ-রাষ্ট্র** অধ্যায়ে। শারীরিক-মানসিক-বৈ্যক্তিক মনুষ্যত্ব বিকাশের এই তিনটি স্তর আলোচনা করে এবং স্বামীজীর নতুন সমাজদর্শনের মূল নীতিগুলি তুলে ধরে দেখানো হয়েছে, অর্থনৈতিক শোষণ-ই শোষণের একমাত্র রূপ নয়, বুদ্ধির সাহায্যে অস্ত্রের সাহায্যে, এমন-কি সংগঠনের শক্তি দিয়েও যুগে-যুগে শোষণ চালানো হয়েছে।

ইতিহাসের দর্শন অধ্যায়ে মানবেতিহাসের তাৎপর্য নিয়ে বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্য আলোচনা করে স্বামীজীর সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে কিভাবে ইতিহাসে চারটি পর্যায় (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র যুগসমূহ) গড়ে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে,কোনও একটি নির্দিষ্ট স্তরে এসে বিপ্লব থেমে যেতে পারেনা। সামাজিক মৌল শক্তিগুলির এক বা একাধিক শক্তি যখন কোনো গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তখনই সমাজের সঙ্কোচন ঘটে। যে ঐতিহাসিক ঘটনা এই সঙ্কোচনের দিকে সমাজকে নিয়ে যায় সেই ঘটনা প্রতিক্রিয়াশীল। আর, মৌল শক্তিগুলি যে ঘটনা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজের প্রসারণ ঘটায় সেই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রগতিশীল।

বিপ্লব কি ও কেন অধ্যায়ে স্বামীজীর দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভাল-মন্দ দিকগুলি আলোচনা করে বলা হয়েছে, মূল্যবোধের পরিবর্তন না ঘটালে বিপ্লব পথভ্রষ্ট হবেই, লেনিন-ওয়াশিংটন-কামাল পাশার বদলে আবির্ভাব ঘটবে হিটলার-খোমেনি-কারমাল-পলপটের। সাংস্কৃতিক বিপ্লব না ঘটিয়ে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাতে গেলে প্রকৃত শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠবে না। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রেণীহীন সমাজের অর্থ বিশেষ অধিকারের (Special priviledge) বিলোপ। তাই কেবল রাজনৈতিক নয়, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্রিয়া চাই।

গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা বর্তমান পৃথিবীতে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, কোন্ সংকটের মধ্যে পড়েছেন সে-কথা আলোচনা করা হয়েছে **বিপ্লবের তত্ত্ব ও স্বামীজী** অধ্যায়ে। সেই সাথে মারকিউজ, ফ্যানন, গান্ধী,

মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ চিন্তানায়কদের পাশাপাশি স্বামীজীর মৌলিকত্ব কোথায় তাও দেখানো হয়েছে। বুদ্ধ থেকে মার্কস—মৌল সমস্যা দূরীকরণের চেষ্টা করলেও তাঁদের মতবাদেই এমন এক ত্রুটি রয়ে গেছে যা শেষ পর্যন্ত এস্টাব্লিশমেণ্টকেই মদৎ দিয়েছে। স্বামীজী মানব সভ্যতার এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মৌলিক বক্তব্য রেখেছেন। তিনি ঐক্য চেয়েছেন, এস্টাব্লিশমেণ্ট নয়। যুব-সম্প্রদায়ের গুরুত্ববৃদ্ধি, ধনতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সরকারগুলির চারিত্রিক অভিন্নতা, মুক্তমতি বুদ্ধিজীবীদের ওপর অত্যাচার, কনজিউমারিজমের বিকাশ, নতুন পেশাদারী নেতৃত্বের উদ্ভব—বিংশ শতাব্দীর এই পাঁচটি সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ফলে বিশ্বের পটপরিবর্তন দ্রুত হচ্ছে। এদিকে চিন্তাশীলদের সচেতন হওয়া দরকার।

বিপ্লবের পথে তাত্ত্বিক সংগ্রাম ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। একদিকে তাত্ত্বিক সংগ্রাম ও অন্যদিকে সমাজে মূল্যবোধের পরিবর্তন কিভাবে ঘটাতে হবে তা আলোচনা করা হয়েছে **বিপ্লবের পথ** অধ্যায়ে। রূপক কাহিনীর মাধ্যমে বলা হয়েছে আপাতত কোন্ লক্ষ্য সামনে রেখে এগোতে হবে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রূপরেখার পরিচয় দেওয়া হয়েছে এখানে। স্বামীজী চেয়েছিলেন "জনসাধারণের সাহায্যে জনসাধারণের মুক্তি"। মেহনতী গরীব মানুষের প্রতি দৃষ্টি ছিল তাঁর, কিন্তু আহ্বান জানিয়েছিলেন তরুণ ও যুবকদের। বলেছিলেন, যুবসমাজই স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক শ্রেণী। **বিপ্লবের ঋত্বিক** অধ্যায়ে যথার্থ শ্রেণীহীন কারা তা নিয়ে আলোচনা করে যুবসমাজের মানসিক ও সামাজিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। মারকিউজ, ফ্যানন প্রমুখ পরবর্তীকালে যা বলেছেন, এম, এন, রায় ও জয়প্রকাশ যা করতে চেয়েছেন, তা স্বামীজীর মতেরই প্রতিধ্বনি। দার্শনিক ত্রুটিই এস্টাব্লিশমেণ্ট গড়ে তোলে, যার পরিণতি মতান্ধতা। স্বামীজী বলেছিলেন, নেতৃত্বের দুটি বড় দোষ—ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখা এবং ভবিষ্যতেও কি হবে তা না ভাবা। চিত্তমুক্তির বাধা কোথায় এবং কিভাবে মানুষ মুক্তমতির অধিকারী হতে পারে যা তার জীবনকে সামাজিক ও ব্যৈক্তিক দিক দিয়ে উন্নত করবে, সে-বিষয়ে স্বামীজীর পথনির্দেশ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

শেষ অধ্যায় **বিপ্লবের বিরোধী শক্তিসমূহ**। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম প্রধান

ভূমিকা

দেশ ভারতবর্ষের তথাকথিত বিপ্লবী শ্রেণীগুলির সাম্প্রতিক কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, সমাজে আজ অনেকগুলি বিশেষ সুবিধাবাদী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। এরা গাঁদাফুলের মালা পরে বি-বা-দী বাগে আন্দোলন করেন উচ্চহারে বেতন, ডি-এ, বোনাস, ছুটির সুযোগ-সুবিধের জন্য, অথচ বাড়িতে এরাই ঝি-চাকরদের এসব সুবিধে দিতে নারাজ। কেবল ব্যবসায়ীরাই নয়, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ আজ জড়িয়ে পড়েছে ঘুষ, কাজচুরি, কালোটাকার জালে। আজ যারা বিপ্লব বলে চেঁচামেচি করছেন, সেই সব তথাকথিত বিপ্লবীরাই সবচেয়ে অসুবিধেতে পড়বেন প্রকৃত বিপ্লব এলে। এদের মানসিক বাধা কোথায়, সমাজের কোন্ কোন্ গোষ্ঠি বিপ্লবের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, এ সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে বিপ্লবীদের কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে যেমন রোমাঁ রোলাঁ, নিবেদিতা, তিলক, অরবিন্দ, নেতাজী, নেহেরু, হাক্স্লীর মতো মনীষীরা লিখেছেন, তেমনি অসংখ্য স্বল্প-পরিচিত লেখকেরাও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছেন। কমিউনিস্ট দেশগুলিও স্বামীজীর প্রতি মুগ্ধ। মস্কোর ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের ডিরেক্টর ডঃ চেলিশভ লিখেছিলেন, "আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে বিবেকানন্দ যখন আমূল রূপান্তরের কথা বলেছিলেন তখন তিনি সমাজব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ মতবাদের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ সংস্কারক নন, বিপ্লবী।" আবার লাল চীনের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী হুয়াং কিন্ চুয়ান ১৯৮০ সালে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আধুনিক চীনের কাছে বিবেকানন্দ ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব রূপে পরিগণিত। তাঁর দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এবং তাঁর মহাকাব্যিক বিশালতাযুক্ত দেশপ্রেম কেবল ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের বিকাশকে অনুপ্রেরণা দেয়নি, ভারতের বাইরেও প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল।... আমরা বিবেকানন্দের প্রশস্তি করি কারণ তিনি তথ্য থেকে সত্যে উপনীত হবার চেষ্টা করেছেন।" রোলাঁ থেকে হুয়াং, শংকরীপ্রসাদ বসু, সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিবেকানন্দ গবেষকদের চিন্তা থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। কানপুর আই-আই-টি'র অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার বিশ্বাসের লেখা 'বিবেকানন্দের সাম্যবাদ' প্রবন্ধ থেকে কতগুলি পয়েন্ট এই

বইয়ে ব্যবহার করেছি। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নিত্যবোধানন্দ (জেনেভা, সুইজারল্যাণ্ড শাখার), স্বামী রঙ্গনাথানন্দ (হায়দ্রাবাদ), স্বামী স্বাহানন্দ (হলিউড, আমেরিকা), স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ (জিম্বাবোয়ে, আফ্রিকা), স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ (বেলুড়মঠ), স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (গোলপার্ক, কলকাতা) প্রমুখ সন্ন্যাসীদের সাথে আলোচনা করেও উপকৃত হয়েছি। এঁদের সকলের প্রতি আমার ঋণ স্বীকার করছি।

জনবাণী পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক সুশীলকুমার ঘোষ, যুগবাণীর সম্পাদক বিদ্যুৎ বসু, হাতিয়ার-এর সহঃ সম্পাদক দিলীপ চট্টোপাধ্যায় আমার লেখাগুলি ছাপিয়ে শুধু উৎসাহই দেননি, ক্রমাগত তাড়া দিয়েছেন বই হিসেবে প্রকাশ করার জন্য। এঁরা ছাড়া নাম করতে হয় বীরেন দে, সুব্রত কুমার ঘোষ, প্রণবেশ চক্রবর্তী (যুগান্তর) ও সুদেব রায়চৌধুরীর (আনন্দবাজার পত্রিকা)। সজল বসু ও তপন মুখোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলেছি। অর্থের ঝুঁকি নিয়েও তরুণ প্রকাশক তপনবাবু যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। স্বামীজীর বিষয়ে বই ছাপছি, এই পবিত্র অহংকারই তাঁকে উদ্যোগী করেছে এই কাজে। সমাজবিজ্ঞানে গবেষণা, বই লেখা, পত্রিকা সম্পাদনা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত সজলবাবুই ফিনিশিং টাচ দিয়েছেন বইটিতে। নিজের অসংখ্য কাজ থাকা সত্ত্বেও বইটির বিভিন্ন পয়েণ্টে মতামত ব্যক্ত করে, নতুন পয়েণ্ট জুগিয়ে দিয়ে, প্রুফ দেখে, এবং বারবার আমাকে তাড়া দিয়ে তিনি বন্ধুকৃত্য করেছেন। এঁদের সবার কাছেই আমি ঋণী। প্রচ্ছদের জন্য জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং ছাপার জন্য প্রভাবতী প্রেসের কর্মীবৃন্দকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটির বিভিন্ন বক্তব্য সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকারা যদি প্রকাশকের ঠিকানায় আমায় চিঠি পাঠান তবে আনন্দিত হব।

মিত্র কৌটিল্য

প্রথম অধ্যায় ঃ মানুষ-সমাজ-রাষ্ট্র

ইতিহাসের স্রষ্টা—মানুষ

ইতিহাস নিজে নিজেই তৈরী হয়, না মানুষ তাকে সৃষ্টি করে? ইতিহাসের ভাঙাগড়ায় মানুষই সবচেয়ে বড় শক্তি। মানুষই ইতিহাসকে সৃষ্টি করে। সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনে মানুষই প্রধান বিশ্বকর্মা। প্রকৃতির ওপর মানুষ যত বেশি তার প্রভাব বিস্তার করছে, জড়ের ওপর চেতনার আধিপত্য যত বেশি করে স্বীকৃত হচ্ছে, সভ্যতা ও সমাজ ততই উন্নত হচ্ছে—এই তত্ত্বটি তুলে ধরে স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন[১] বুদ্ধি ও কর্মশক্তির সাহায্যে মানুষ পৃথিবীর ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করছে, এটাই ইতিহাস। পশু-পাখির কোন ইতিহাস নেই। কেন নেই? কারণ, প্রকৃতির ওপর তারা প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে না মানুষের মতো। নিয়াণ্ডারথ্যাল মানুষেরও কোন ইতিহাস নেই, যা রয়েছে তা হল অস্তিত্বের হিসেব। অসভ্য যুগের প্রথম পর্বেও (মর্গ্যানের 'এনসিয়েণ্ট সোসাইটি' বইয়ের কথা চিন্তা করুন) হোমো-স্যাপিয়েন মানুষের ইতিহাস নেই, আছে অস্তিত্বের হিসেব। কিন্তু ইতিহাস শুরু হয়ে গেল অসভ্য যুগের দ্বিতীয় পর্ব থেকেই। কারণ মানুষ তখন আগুন জ্বালাতে শিখেছে, প্রকৃতির এক বিশাল শক্তিকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে উদ্যত হয়েছে, প্রকৃতির শক্তিকে সে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে শিখেছে। চাষবাসের আবিষ্কার যখন মানুষ করল, খাদ্য-সংগ্রহকারী থেকে সে হয়ে উঠল খাদ্য-উৎপাদনকারী। ইতিহাসকে সে এগিয়ে দিল আরও সামনে। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একই ব্যাপার দেখা গেছে—মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে, ইতিহাসকে সৃষ্টি করছে।

একটা সমাজে রেনেসাঁস কখন দেখা যায়? সাময়িক নিদ্রাবস্থা থেকে সমাজের মানুষ যখন জেগে ওঠে। পূর্বপুরুষদের চিন্তা আর কাজ অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কিছু যখন মানুষ করতে পারে না, তখন সেই সমাজের ঘুমন্ত অবস্থা। তখন মানুষের জীবন থাকে, কিন্তু ইতিহাস রচিত হয় না। এক

সময় ঘুমন্ত অবস্থার শেষ হয়, নানা কারণে। পূর্বসূরীদের অনুসরণ না করে মানুষ তখন সৃজনশীল কিছু করতে চায়। আর একেই বলে রেনেসাঁস। ফ্রান্সে, আমেরিকায়, রাশিয়ায়, চীনে এই অবস্থা দেখা গেছে, গত শতাব্দীতে ভারতেও এ ঘটনা ঘটেছে। ইতিহাস তখন এগিয়ে চলে। 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা' ধরে মানুষ তখন এগিয়ে যেতে চায় তার বুদ্ধি আর কর্মশক্তিকে অবলম্বন করে।

যারা বলেন বস্তু আর মনের মধ্যে বস্তুই মুখ্য, মন গৌণ, তারা ভুল বলেন। বস্তু কখনও ইতিহাস রচনা করে না, ইতিহাসের মূল নিয়ামক মানুষের মন। আবার দেখুন, একই বস্তু পশু ও মানুষের কাছে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। মানুষের মনে ভাব বা আইডিয়া আছে বলেই সে বস্তুটিকে অন্য একটি রূপ দেয় বা তার সাহায্যে কাজ করে। পশুর মনে এই আইডিয়া বিশেষ নেই বলেই সে বস্তুকে সব সময় কাজে লাগাতে পারে না। এক টুকরো লোহাকে আদিম মানুষ মামুলী অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাত। কিন্তু আধুনিক মানুষ তাকেই সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক পার্টস্ হিসেবে ব্যবহার করছে। একটা খালি টিনের বাক্সকে একজন সাহিত্যের ছাত্র তার কাজে ব্যবহার করে কোন জিনিষ রাখতে, কিন্তু একজন বিজ্ঞানের ছাত্র সেই বাক্সটি থেকেই নতুন কোন জিনিস তৈরী করতে পারে। এটা ঠিক কথা যে বস্তুটিকে দেখেই বিজ্ঞানের ছাত্রের মনে নতুন আইডিয়া এসেছে। এ সত্ত্বেও কিন্তু বস্তুটিকে মুখ্য বলে ধরার কোন কারণ নেই, যেহেতু ঐ বস্তুটিকে সাহিত্যের ছাত্রের মনে উন্নত কোন আইডিয়ার সৃষ্টি করতে পারেননি।

মানুষের উন্নতির অর্থ তার মনের উন্নতি। ইতিহাসের অর্থ, মানুষের মন প্রাকৃতিকে কতখানি নিজের কাজে লাগাচ্ছে। মানুষ মূলত পরিবেশের দাস নয়। পরিবেশ তাকে এগিয়ে যেতে বা পিছিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু এই মানুষের মধ্যেই এমন একটা শক্তি আছে যার দ্বারা সে পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যেতে পারে এবং সৃজনীশক্তির সাহায্যে পরিবেশকে পাল্টে দিতে পারে। এই শক্তি যার মধ্যে যত বেশি তাকেই আমরা তত উন্নত বলে ধরি।

মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেবার জন্য নয়, বরং ব্যক্তিত্ব

বিকাশের আধার হিসেবেই সমাজের উদ্ভব। সমাজ যেহেতু বৈচিত্র্যময় অসংখ্য ব্যক্তিত্বের সমাহার, তাই সমাজের লক্ষ্যে বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বাকীয়তা আছে বলে মানুষকে স্বাধীনভাবে বিকাশের পূর্ণ সুযোগ করে দেওয়া সমাজের লক্ষ্য, রাষ্ট্রের কর্তব্য।

মূল সমস্যা

বর্তমান বিশ্বে সাধারণ মানুষের মূল সমস্যা কি? রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতির নানান পথের উদ্ভাবনেও যে সমস্যাটি আগের মতেই অগ্নিগর্ভ, তার স্বরূপ কি? ঠিকভাবে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, সমস্যাটি হল বিশ্বাসের সংকট, মূল্যবোধের সংকট। প্রাচীন যুগের ঈশ্বর-বিশ্বাস যখন মানুষের সব সমস্যার সমাধান করতে পারল না, তখন শুরু হল নতুন সমাজদর্শনের চিন্তা। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে নানান দর্শন উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু মূল সমস্যাটি আজও অমীমাংসিত থেকে গেছে।

কেন? গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে যে-সব পথের উপস্থাপনা করা হয়েছে, সে-সবই মানুষকে দেখেছে অর্থনৈতিক জীব হিসেবে। অর্থাৎ মানুষের খাওয়া-পরার অভাবকেই প্রধান বলে ধরা হয়েছে এবং শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের দ্বারা। এই দুটি বিষয়ই সব তন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। সমাজ তো মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই নয়, অস্তিত্বের বিকাশের জন্যও। অর্থাৎ, সমাজের মূল উদ্দেশ্য—ব্যক্তিত্বের বিকাশ। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক কোন গ্রামে কৃষক-বিপ্লব শুরু হল। কোন কর্ম পন্থা এতে দেখা যাবে? বিপ্লবের নেতারা চেষ্টা করবেন যাতে কৃষকেরা জমি পান, বছরে তিনটি ফসল তুলতে পারেন নিশ্চিন্তে। অর্থাৎ, মানুষকে অর্থ-নৈতিক জীব হিসেবে মনে করার দৃষ্টিভঙ্গিই নেতাদের সাম্প্রতিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, বিপ্লবকে মানবসত্তার গভীরে নিয়ে যাবার তাগিদ দেখা যায় না। অথচ শুধু কৃষক-বিপ্লব কেন, যে-কোনও বিপ্লবের মূল লক্ষ্যই হওয়া উচিত মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা—বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ[২] তবুও আমরা দেখি, শুধু জমি পাইয়ে দেওয়াতেই অধিকাংশ বিপ্লব সীমিত থাকে। কৃষককে যদি সত্যিই আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হয়, তবে প্রথমেই তাকে বোঝাতে হবে যে স্বীয় কর্মদক্ষতায় যে-কোন রকম অবস্থার পরিবর্তন

ঘটানো যায়। এবং এই কর্মদক্ষতায় মানুষ যে শুধু বছরে তিনটি ফসলই তুলতে পারে তা নয়, গ্রামের চেহারাও পাল্টে দিতে পারে। আর তখনই কৃষক-বিপ্লব রূপান্তরিত হবে গ্রাম-বিপ্লবে। গ্রামবাসীরা তখন নিজেরাই মিলিত হয়ে গ্রামের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেবে। গ্রামে একটি স্কুল করা, পুকুরগুলির সংস্কার করা, রাস্তাঘাট তৈরী করা ইত্যাদি কাজে তারাই এগিয়ে আসবে। কারণ, তারা দেখেছে স্বীয় কর্মদক্ষতার নিদর্শন, তাদের বেড়েছে আত্মবিশ্বাস। সংক্ষেপে বলা যায়,তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে। এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে যদি জোর না নেওয়া যায় তবে কোন বিপ্লবই সার্থকতা লাভ করতে পারে না। স্বামীজীর ভাষায়ঃ 'লোকগুলিকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতে যত ঐশ্বর্য আছে সব ঢেলে দিলেও ভারতের একটা ছোট গ্রামেরও যথার্থ সাহায্য করতে পারা যায় না।'[৩]
এবারে দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। কি গণতন্ত্রে কি সমাজতন্ত্রে, নানান ধরণের শাসনকার্যের কথা রয়েছে। এ সবেরই মূল উদ্দেশ্য সুশাসন। সুশাসনের ভার থাকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে, কিংবা কোনও গোষ্ঠীর হাতে, কিংবা কোন দলীয় নেতাদের হাতে। রাষ্ট্রনীতি-বিদেরা এই সুশাসনের ওপরই মূল লক্ষ্য নিবিষ্ট রেখে ভুল করেন। মনে রাখতে হবে, সুশাসন স্বশাসনের বিকল্প হতে পারে না! রাষ্ট্রকে 'ফর দ্য পীপল' ও 'অব দ্য পীপল' হতে হবে ঠিকই, কিন্তু আসলে কথাটি হল, 'বাই দ্য পীপল'। এটার ওপরই জোর দিতে হবে বেশি। একটি রাষ্ট্র যতই কল্যাণমূলক হোক, তা সর্বগ্রাসী রূপ ধরলে রাষ্ট্রনীতির আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। স্বামীজী এই দিকটিই তুলে ধরে বলেছেনঃ দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজা কখনও স্বায়ত্তশাসন শেখে না; ঐ পালিত রক্ষিত সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হলে সর্বনাশ।'[৪]

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

আসল কথা, চাই মুক্ত মানুষের সমাজ। আর এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োজন, মানুষের আত্মবিশ্বাসের ও আত্মশক্তির জাগরণ। শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া দরকার মুক্ত মন। সন্দেহবাদীরাই প্রগতির অগ্রদূত। তাই সব কিছু যাচাই করার মতো মন দরকার। কমিউনিস্ট চীনের ১২।১৩

বছরের ছেলে-মেয়েরাও বরুণ সেনগুপ্তের কাছে গ্যাং অব ফোর-এর নিন্দা করেছে। এই সব চীনা ছাত্র-ছাত্রীদের মনোভাবের সাথে ভারতের অজ পাড়াগাঁর একজন মেয়ের অলৌকিকত্বের প্রতি বিশ্বাসের কোনও তফাৎ নেই। এর কোনটিই মানুষকে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দেয় না। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ যেমন অলৌকিক কোন শক্তির দাস নয়, তেমনি সে দাস নয় কোন রাজনৈতিক পরিবেশ বা গোষ্ঠীর।[৫] বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধার পাবার এক মাত্র পন্থা হবে মানুষকে এই কথাটা বুঝিয়ে বলা, এই তত্ত্ব প্রচার করা যে মানুষ পরিবেশের দাস নয়। পরিবেশ পাল্টে গেলে পশু-পাখি নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন এনে নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ায়। মানুষ কিন্তু তা করে না, সে বরং পরিবেশকেই বদলে দিয়ে তাকে নিজের প্রয়োজনোপযোগী করে নেয়।

তাহলে প্রশ্নটা কি দাঁড়াচ্ছে, গণতন্ত্র চাই, না সমাজতন্ত্র? স্বামীজী যে তত্ত্বটি তুলে ধরেছেন তা হল—গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতার ভিত্তিতে সাম্য।[৬] রেজিমেন্টেড সমাজ যেমন সভ্যতার অনুকূল নয়, তেমনি 'ল্যাসা-ফেয়ার'ও সামাজিক উন্নতি আনতে পারে না। বহুমুখী বিকাশের ওপর গণতন্ত্রী যে গুরুত্ব দেন তা যেমন সঙ্গত, সমাজতন্ত্রীর যৌথস্বার্থের গুরুত্বও তেমনি সঙ্গত। আর সেইজন্যই এমন সমাজদর্শনের প্রয়োজন যা এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটাবে। এই সমাজদর্শনের ভিত্তি অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতি হলে চলবে না, এর ভিত্তি স্থাপিত করতে হবে মানবতাবাদের ওপর। স্বামীজী স্পষ্টই বলেছেন, সংসদে কতগুলি আইন চালু করে কোন দেশের অবস্থা পাল্টানো যায় না, দেশের অবস্থা নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার ওপর।[৭] তিনি চেয়েছেন, আইনের শাসন নয়, মানুষ পরিচালিত হোক তার কল্যাণময়ী যুক্তিবাদের সাহায্যে। এর ফলে সে একদিকে যেমন অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না, অন্যদিকে স্বীয় স্বাধীনতার ব্যাপারেও সে অন্যের হস্তক্ষেপ সহ্য করবে না।

সমাজ দর্শনের মূলনীতি

এই নতুন সমাজ দর্শনের মূল নীতিগুলি কি হবে? প্রথমত, মানুষের মধ্যে শক্তি-সম্ভাবনা প্রচুর। দ্বিতীয়ত, প্রচেষ্টার দ্বারা সে নিজের শক্তি ও

[সত্তের]

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে অনেক উর্ধ্বে উঠতে পারে। তৃতীয়ত, মানুষ অর্থনৈতিক জীব নয়, মনো-সামাজিক জীব। চতুর্থত, মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে আছে তার মুক্তিপিয়াসী মন, ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রবল আকাঙ্খা। পঞ্চমত, মুক্ত মনের মানুষ তৈরী করাই বিপ্লবের লক্ষ্য। এই পাঁচটি নীতিকে অ্যাকসিয়ম্ বা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে না নিয়ে স্বামীজী মানব ইতিহাসের দিকে তাকিয়েই এইগুলি উপস্থাপিত করেছেন। এইগুলির ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা ও যৌক্তিক ধারা নিয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন।

নতুন সমাজ হবে ব্যক্তি মানুষের বিকাশের অসীম সম্ভাবনাময় উৎস। জোর করে আইনের সাহায্যে নয় মানুষ গড়ে উঠবে তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে, নিজস্ব বিবেকবুদ্ধির কল্যাণময়ী শক্তির প্রেরণায়. যতই কল্যাণকর হোক, রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী রূপকে বিদায় দিতে হবে। প্রাথমিক সামান্য কয়েকটি দায়িত্ব পালন করা ছাড়া রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব থাকবে না, স্বাধীনতার মুক্ত বাতাবরণে মানুষ নিজেকে গড়ে তুলবে সার্বিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সমবায় শক্তির যথাযথ উদ্বোধন ঘটাতে হবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনসাধারণ নিজের উন্নতি পরিকল্পনা নিজেরাই করবে, আর তার সাথে বুঝবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ সম্মিলিত হয়ে কিভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী হওয়া সম্ভব। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির মতো কোন শ্রেণী বা মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলির মতো কোন গোষ্ঠীর দ্বারা শাসন নয়, এর ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে জনগণের মধ্য হতে। স্বামীজী বলেছেন: আগ্রহ না থাকলে কেউ খাটে না, তাই সকলকে দেখাতে হবে যে প্রত্যেকেরই কাজে ও সম্পত্তিতে অংশ আছে এবং কার্যধারা সম্বন্ধে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে।[৮]

শোষণের প্রকারভেদ

মুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে শোষণের নিরাকরণ অন্যতম প্রধান শর্ত হওয়া চাই। তাবড় তাবড় বিপ্লবীরাও একটি বিষয়ে ভুল করেন। তারা মনে করেন, অর্থনৈতিক শোষণই শোষণের একমাত্র রূপ। কিন্তু আসলে তা নয়। স্বামীজীর মতে, মানব সমাজে চার রকম শোষণ দেখতে পাওয়া যায়।[৯] প্রথমত, জ্ঞান বা বুদ্ধির সাহায্যে শোষণ। প্রাচীন যুগে পাত্রী-

পুরোহিত মৌলবীরা এবং বর্তমান যুগে বুদ্ধিজীবীরা এর সাহায্যে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়েছে ও ঠকাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, অস্ত্রশক্তির সাহায্যে শোষণ সামরিক বাহিনীই এর মূল হোতা এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায় এর লক্ষণ সুস্পষ্ট। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক শোষণ। বিষয়টি সকলেই বোঝেন চতুর্থত, সংগঠিত শক্তির জোরে শোষণ করা। বহু শ্রমিক-নেতার মধ্যে এটি লক্ষ্য করা যায় এই সব রকম শোষণই বন্ধ হবে যদি জনসাধারণ সচেতন হয়ে ওঠে। জ্ঞানের চর্চা ও মুক্ত মনের সংখ্যা বাড়ালেই শোষণ বন্ধ হবে মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে দিতে হবে, তাদের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করাতে হবে। এর একমাত্র পথ হল উপযুক্ত শিক্ষা।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি জাতিরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সমাজ মানস এবং পরিবেশ এক-এক দেশে এক-এক রকম। তাই, সব দেশের উন্নতির পথ এক হতে পারে না। রাশিয়ার পথ চীন মেনে নেয়নি, বৃটেনের পথ ফ্রান্স অনুসরণ করেনি। এমনকি চীন ও রাশিয়ার প্রতিবেশী সদস্য রাষ্ট্র, উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রনায়ক কিম-ইল-সুং পর্যন্ত বলেছেন: "Some advocate the Soviet way and others the Chinese. But is it not high time to work out our own ?"১০ প্রশ্নটি শুধু কিম-ইল সুংয়েরই নয়, তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশেরই এই প্রশ্ন। বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জাপান ও পশ্চিম জার্মানী মাত্র ২৫ বছরে দ্রুত উন্নতি করেছে ধনতান্ত্রিক পথেই. কুড়ি বছরে স্থবির চীন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে সাম্যবাদী পন্থায়, আবার কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার বজায় রেখেই ইস্রায়েল চারদিকে শত্রুর মোকাবিলা করেছে এবং দেশকে চমকপ্রদ উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আবার দেখুন, শিল্পে অনগ্রসর রাশিয়াতে লেনিন শ্রমিক-বিপ্লব গড়ে তুললেন, অথচ শিল্পোন্নত জার্মানীতে লাইবনীখ্‌ট ব্যর্থ হলেন, মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে আধুনিক যুগে তুরস্ককে উন্নীত করলেন কামাল পাশা অথচ আফগানিস্থানে আমানুল্লা ব্যর্থ হলেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলায় বিপ্লব ঘটেনি অথচ আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যেও ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটেছে বহুবার। ইতিহাসের এসব তথ্য প্রমাণ করে যে সব দেশের মুক্তির পথ এক নয়। বলিভিয়াতে চে গুয়েভারার আত্মদান এই মিথ্যা ধারণারই পরিণাম.

যে মিথ্যা ধারণা সবাইকে একই মাপের পোশাক পরতে বলে। এই যে বিভিন্ন দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, এর প্রতি স্বামীজী অনেক আগেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন।[১১] এই বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর না দিয়ে কোন শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিলে তা পরিণামে সুখের হয় না। প্রাথমিক-ভাবে কিছুটা উন্নতি দেখা গেলেও ভবিষ্যতে এই শাসনব্যবস্থাকে নিজেই নিজের মুখোমুখি হতে হয়। ভিয়েৎনামে আমেরিকার এই পরিণতিই ঘটেছিল, অক্টোবর বিপ্লবের দীর্ঘকাল পরে রাশিয়া আজ এই অবস্থাতেই পড়েছে। বাংলাদেশ, ইরান, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, চিলি, আর্জেন্টিনা, বার্মা, উঃ আয়ারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড আজ তাই অগ্নিগর্ভ অবস্থায়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

সম-সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ একত্রে মিলে সমাজ সৃষ্টি করেছে। এই সমাজে কিভাবে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল সে সম্বন্ধে স্বামীজী এক সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সমাজের ক্রমবিকাশেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি।[১২] সমতলবাসী সমাজ, পার্বত্য সমাজ, প্রভৃতি বিভিন্ন মনুষ্য সমাজের মধ্যে যখন বিভিন্ন কারণে মেলামেশা হতে লাগল, তার মধ্য থেকে আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হতে আরম্ভ করল। এই চেতনার স্ফুরণ আবার বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন কারণে হয়েছে। এর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ অন্যতম প্রধান কারণ। "অসুরেরা আহারাভাব হলেই দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্রকূল হতে গ্রাম নগর লুঠতে এল। কখনও বা ধন-ধান্যের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগল। দেবতারা বহুজন একত্র হতে না পারলেই অসুরের হাতে মৃত্যু, ক্রমে দু-দিকেই দল বাড়তে লাগল, লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগল, লক্ষ লক্ষ অসুর একত্র হতে লাগল। মহাসংঘর্ষ, মেশামেশি, জেতাজিতি চলতে লাগল। এ সব রকমের মানুষ মিলেমিশে বর্তমান সমাজ, বর্তমান প্রথাসকলের সৃষ্টি হতে লাগল, নানা রকমের নূতন ভাবের সৃষ্টি হতে লাগল, নানা বিদ্যার আলোচনা চলল।"[১৩] নিরাপত্তার খাতিরে সমাজে সামরিক সংগঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল এবং সামরিক নায়ক বা রাজার সৃষ্টি হল।

রক্তের সম্বন্ধ যেমন সমাজ সৃষ্টির অন্যতম কারণ, রাষ্ট্রেরও তাই।

আত্মীয়তা বোধে রক্তের সম্বন্ধই প্রধান কারণ ছিল আদিম সমাজে। একই পূর্ব-পুরুষকে মেনে নিয়ে বংশধরেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে গোষ্ঠী চেতনার পরিচয় দিল, তার গোষ্ঠী প্রধানের হাতে ভার রইল সমাজের বা সেই গোষ্ঠীর স্বার্থ বজায় রাখা। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে স্বামীজী দেখিয়েছেন 'স্বজাতি-বাৎসল্য' কিভাবে গ্রীক. রোমক, আরব, স্পেনীয়. ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান ও আমেরিকানদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগিয়েছে।[১৭]

রাষ্ট্রের উৎপত্তির আরেকটি প্রধান কারণ ধর্ম। ধর্মের অজুহাতে রাজা ও পুরোহিতেরা প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করেছেন। বর্তমান বিশ্বেও দেখা যায়, ইহুদী ও মুসলীম রাষ্ট্রগুলি কেবলমাত্র ধর্মের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। পাকিস্তানের জন্মের কারণও ধর্ম। আরব রাষ্ট্র সম্বন্ধে স্বামীজী লিখেছেন—"আরব মরুভূমে মুসলমানি ধর্মের উদয় হল। বন্যপশুপ্রায় আরব এক মহাপুরুষের প্রেরণাবলে অদম্য তেজে অনাহত বলে পৃথিবীর উপর আঘাত করল। পশ্চিম পূর্ব দুপ্রান্ত থেকে সে তরঙ্গ ইউরোপে প্রবেশ করল. সে স্রোতমুখে ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের বিদ্যা বুদ্ধি ইউরোপে প্রবেশ করতে লাগল।"[১৮] ভারতের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়েও তিনি বলেছেন—"উত্তরভারতে একজন শক্তিমান দিব্য পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সৃজনী প্রতিভাসম্পন্ন শেষ শিখগুরু গুরু গোবিন্দসিংহের আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর ফলেই শিখ সম্প্রদায়ের সর্বজনবিদিত রাজনীতি সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল।"[১৯]

ব্যক্তিগত সম্পত্তিও রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থে স্বামীজী দেখিয়েছেন. কিভাবে আদিম সমাজে সম্পত্তি-বৈষম্যের জন্য মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রচেতনা জাগ্রত হয়েছে। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে স্বামীজী একথাই সবিস্তারে বুঝিয়েছেন। সম্পত্তি বৈষম্যের ফলে সমাজে যে চৌর্যবৃত্তি দেখা দেয় এবং এক সমাজ আরেকটির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তার নিরাকরণের জন্য আইন-প্রণয়ন ও শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, এই ক্রমবিকাশের পথে আমরা পাই রাষ্ট্রকে।

এইসব বিভিন্ন কারণে মানুষের মধ্যে দেখা দেয় রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা। সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার, বহিঃশত্রু থেকে নিরাপত্তা, এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা ইত্যাদি কারণে একটি সুদৃঢ় শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা মানুষ

উপলব্ধি করে। সামাজিক চুক্তির ফলে যদিও বিভিন্ন সমাজে এই শাসনযন্ত্রের বিভিন্নতা দেখা যায়, তবুও এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানুষ স্থির বিশ্বাসে এসেছে এবং রাষ্ট্র গঠন করেছে। স্বামীজীর ভাষায়—"নিয়ম আছে, প্রণালী আছে, নির্ধারিত অংশ আছে, কর-সংগ্রহ ও সৈন্যচালনা বা বিচার-সম্পাদন বা দণ্ড-পুরস্কার সকল বিষয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম আছে।"[১৭]

রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণগুলি আলোচনা করে স্বামীজী তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গও রেখেছেন। জীব-জগতের বিবর্তন যেমন তিনটি স্তরে হয়, রাষ্ট্রেরও তাই। গাছপালা থেকে শুরু করে এ্যামিবা-মাছ-পাখী-পশু পর্যন্ত বিবর্তন জড়িয়ে আছে দৈহিক ও মানসিক উভয় স্তরকে নিয়ে। আদিম মানুষও অনেকটা তাই। কিন্তু বর্তমান মানুষের মধ্যে যে বিবর্তন চলছে তা মানসিক। ঠিক তেমনি আদিম সমাজে শক্তি ও দৈহিক প্রয়োজনেই রাষ্ট্র ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, কিন্তু পরবর্তী রাষ্ট্র বিবর্তনে প্রধান শক্তি মানুষের চিন্তাধারা। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে বেন্থাম-কোঁতে, মার্কস ও ফ্যাসিজম-নাজিজম প্রভৃতি মতবাদে ফোর্স বা শক্তিকেই রাষ্ট্রের ভিত্তি বলে ধরা হয়েছে এবং গ্রীন-ম্যাকাইভার প্রভৃতির মতে এই ভিত্তি মানসিক বা উইল পাওয়ার। স্বামীজী সেখানে উভয় মতের পর্যালোচনা করে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সাহায্যে মূল ভিত্তিটি ধরিয়ে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সব কিছুরই কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। যুগে যুগে নানান বিপ্লব হয়েছে, রাজার মাথা লুটিয়ে পড়েছে গিলোটিনের আঘাতে, পোপের সাম্রাজ্য কেড়ে দেওয়া হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের কবর গাঁথা হয়েছে দেশে দেশে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা দাবীর প্রতিধ্বনি উঠেছে দিকে দিকে সব কিছুরই লক্ষ্য, ব্যক্তি মানুষের বিকাশ। কিন্তু নানান কারণে বারবার হারিয়ে গেছে এই লক্ষ্য। চেষ্টা হয়েছে আবার তার জাগরণ ঘটাবার। এই তো পৃথিবীর ইতিহাস! কিন্তু মানুষ কোথায়? রাজতন্ত্র পোপতন্ত্র শেষ করে আওয়াজ উঠেছিল গণতন্ত্রের। পাশ্চাত্য জগতের নানান গণতান্ত্রিক পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেল। এল মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের বাণী। সাধারণ মানুষের খাওয়া পরার দাবী অনেকটা স্বীকার করে নিয়েও এই মত শেষ পর্যন্ত অচলায়তনে পরিণত হল। শরীরটাই তো শুধু মানুষ নয়। মানুষের আসল সত্তা তার চেতনায়। সেই সত্তার দাবীতে

সোচ্চার পশ্চিম ইউরোপের মার্কসবাদী দলগুলি। আজ তৃতীয় দুনিয়া চাইছে নতুন এক দর্শন, যে দর্শন মানুষের মুক্তির দর্শন।

সুন্দর একটি মন্তব্য করেছিলেন স্বামীজী। তিনি বলেছিলেন: সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হোক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সেই শক্তির আধার জনসাধারণ। যে শাসক সম্প্রদায় যত পরিমাণে এই জনসাধারণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবে, সেই পরিমাণে এই সম্প্রদায় দুর্বল হবে। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাদের কাছ থেকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এই শাসনশক্তি লাভ করা হয় সেই জনসাধারণ কিছু দিনের মধ্যেই শাসক সম্প্রদায়ের মন থেকে মুছে যায়। পুরোহিত শক্তি এক সময় শক্তির আধার জনসাধারণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিল বলেই প্রজা-শক্তির সাহায্যে রাজারা পুরোহিতদের পরাস্ত করতে পেরেছিল। রাজারাও নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে প্রজাশক্তি ও নিজেদের মধ্যে [illegible] ব্যবধান তৈরী করেছিল, তার ফলে প্রজাশক্তির সাহায্যে বণিকেরা রাজাদের মেরে ফেলল বা পুতুল বানিয়ে রাখল। এরপর বণিকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করল এবং জনসাধারণের সাহায্য অনাবশ্যক মনে করে জনসাধারণ থেকে নিজেরা দূরে সরে গেল, এবং এটাই হচ্ছে বণিকশক্তির মৃত্যুর লক্ষণ।'[১]

মূল সমস্যাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন স্বামীজী। জনসাধারণ যাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয় তারা শাসক সম্প্রদায় হিসেবে নিজস্ব গোষ্ঠী তৈরী করে, নিজেরা যা ভাল বোঝে তাই চাপিয়ে দেয় জনসাধারণের ওপর। তারা জানতে চায়না জনসাধারণের মনের কথা, সাধারণ মানুষকে ভুলে গিয়ে তারা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে। ব্রাহ্মণ-শাসনে (পুরোহিতশক্তি) দেখা যায় সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা, ক্ষত্রিয়-শাসনে চলে সমস্ত পার্থিবশক্তি কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াস, বৈশ্য-শাসনে (বণিকশক্তি) কেন্দ্রীভূত হয় সমাজের অর্থ-সম্পদ, শূদ্র-শাসনে (চীন রাশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রে) কেন্দ্রীভূত হয় সমাজের শাসন ক্ষমতা। পরিণাম? স্বামীজী বলেছেন: হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চার করা দরকার, কিন্তু সেই রক্ত যদি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে না পড়ে তাহলেই মৃত্যু। কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার জন্যই, যদি তা না হয় তবে সেই সমাজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।[১২]

কথাগুলি স্বামীজী বলেছিলেন গত শতাব্দীতে, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর

শেষভাগেও কতো প্রাসঙ্গিক। সব নীতিরই পরশপাথর যে মানুষ সাধারণ মানুষই যে সব কিছুর লক্ষ্য, এ-কথাটাই তিনি বার বার তুলে ধরেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রনীতিবিদেরা স্বামীজীর কথার তাৎপর্য সঠিকভাবে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

সমস্যাটা কোথায় ? গণতন্ত্রকে "ইনডাইরেক্ট" করে রাখা। শুধু প্রতিনিধিদের হাতে ভার দিলেই চলবে না, ক্ষমতা দিতে হবে সাধারণ মানুষের হাতে। বিকেন্দ্রীকরণের সাহায্যে সাধারণ মানুষকেই করে তুলতে হবে সমাজের প্রকৃত পরিচালক। আর এটি সম্ভব হবে গণ-পঞ্চায়েতের হাতে মূল শক্তির রাশি তুলে দিলে। "বর্তমান ভারত" গ্রন্থের স্বায়ত্তশাসন অনুচ্ছেদে স্বামীজী এটি আলোচনা করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, সাধারণ মানুষের হাতে চেঁচামেচি করা ছাড়া অন্য কোনও ক্ষমতা নেই। কি গণতন্ত্রে কি সমাজতন্ত্রে, শাসন পরিচালনা করে সরকার, জনসাধারণ সে অনুসারে কাজ করে। প্রয়োজন ঠিক এর বিপরীত। মূল পরিচালক হবে জনসাধারণ।

মনুষ্যত্ব বিকাশের তিনটি স্তর

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্র. এই দুই মতেই মানুষকে অর্থনৈতিক জীব হিসাবে দেখা হয়েছে। ফলে উভয় শাসন প্রণালীতেই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করাতে দণ্ড ও পুরস্কার দুয়েরই ব্যবস্থা আছে। এই মৌল দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটিতেই এই দুই মতবাদ নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক চাহিদা মানব-মনের স্বাভাবিক চাহিদা নয়, একটি সামাজিক ক্রিয়া। পণ্য বিনিময়ের সুবিধার জন্য অর্থ বা মুদ্রার প্রচলন। সঞ্চিত ক্রয় ক্ষমতা হিসেবে মুদ্রার ভূমিকাই মানব-মনে অর্থনৈতিক চাহিদার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ মুদ্রা উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। লক্ষ্য কি? সুখী জীবন, সুন্দর জীবন ; দার্শনিক ভাষায় বলা যায়—জীবনের বিকাশ। এই জীবনের বিকাশ ঘটাতেই অর্থ বা মুদ্রা ব্যবহৃত হচ্ছে। পোশাক আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু সে জন্য মানুষকে পোশাক-নির্ভর জীব বলা যায় কি? না। ঠিক তেমনি, অর্থ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বলে মানুষকে অর্থনৈতিক জীবও বলা যায় না। অর্থের সাথে মানব প্রগতির অঙ্গাঙ্গীভাব নেই। মানুষের খাওয়া-পরায় অর্থ কিছুটা সাহায্য করে, কিন্তু মানুষের প্রকৃত বিকাশে অর্থের

ভূমিকা ততটা নেই। অর্থ থাকলে মানুষ চিন্তাশীল, মহান হয়ে ওঠে, এই ধারণা ভ্রান্ত। প্রমাণিতও।

তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে কি? মানুষের দৈহিক স্তরের বিকাশে অর্থের কিছুটা ভূমিকা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সর্বাঙ্গীন বিকাশে অর্থ অসহায়। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রে মানুষকে অর্থনৈতিক জীব হিসেবে গণ্য করায় মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ রুদ্ধ। রাষ্ট্রের নেতারা 'মানুষ অর্থনৈতিক জীব' এই প্রত্যয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকায় অর্থনৈতিক সংকটকেই প্রধান সমস্যা হিসাবে ধরা হচ্ছে এবং সমস্ত প্রচেষ্টার লক্ষ্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আর এই নতুন ব্যবস্থা হিসেবে চেষ্টা চলছে ধন-বৈষম্য কমাবার। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারলেই রাষ্ট্রনেতারা মনে করলেন যে তাঁদের কর্তব্য শেষ। সেই সাথে তারা এ'ও মনে করছেন, রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য ধনবৈষম্য কমানো, কারণ এটাই মানুষের প্রধান চাহিদা। এইভাবে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলছেন যারা, জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের দাবী উপেক্ষিত হচ্ছে।

মানব মনের চাহিদা দু'টি—জীবন রক্ষা ও জীবনের বিকাশ অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা প্রথমটির প্রতি অতিরিক্ত নজর দিতে গিয়ে দ্বিতীয়টিকে অবহেলা করেছেন। মনে রাখতে হবে, সুশাসনের চেয়ে বড় স্বশাসন। জীবনের বিকাশ ঘটে মানুষের মূল সত্তায়, আর মস্তিষ্কেই মানুষের সেই সত্তা লুকিয়ে আছে। মানুষের বিকাশ ঘটাতে হলে চাই মুক্ত চিন্তার পরিবেশ। মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে দিতে হবে তার হাতে দায়িত্ব দিয়ে তার সৃজনী-শক্তির উন্মেষ ঘটাতে হবে।

মানব-অস্তিত্বের তিনটি স্তর—দৈহিক, মানসিক, ব্যৈক্তিক। দৈহিক বিকাশের জন্য দরকার খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি। মানসিক বিকাশের জন্য চাই শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা। দৈহিক ও মানসিক বিকাশের চাহিদাগুলির অনেকটা রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে মিটতে পারে। ব্যৈক্তিক স্তরের বিকাশে মানুষ পরিণত হয় বুদ্ধ, অশোক, লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, আইনস্টাইন, কালিদাস, হেগেল, কান্ট, রাসেল, রবীন্দ্রনাথ, রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ মণীষীতে। কিন্তু এই বিকাশে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে পারে না, যেটুকু পারে তা হল পরোক্ষ সাহায্য। সাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদগুলি কেবল জনসাধারণের দৈহিক ও

মানসিক স্তরের বিকাশের ওপরই জোর দেয়, যদিও একটি সমাজের সজীবতা প্রমাণিত হয় যখন সেই সমাজে অধিক সংখ্যায় পূর্বোক্ত মনীষীদের আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ যখন সমাজে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। স্বামীজীর রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের মূল কথাই হল, সমাজকে এমনভাবে তৈরী করা যাতে মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। দৈহিক ও মানসিক বিকাশের দিকে নজর দিতে হবে, কিন্তু লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে ঐ ব্যৈক্তিক বিকাশের ওপর।

কি পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে, কি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রে, সার্বভৌম সমাজ গড়ে তোলার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। সার্বভৌম সমাজ কাকে বলে? যে সমাজে দৈহিক মানসিক ব্যৈক্তিক বিকাশের সব সুযোগ আছে। খাওয়া ও শিক্ষার সুবিধে যেমন দরকার, স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করার সুবিধেও তেমনি দরকার। কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে জনসাধারণের ট্রাষ্টি বলে ঘোষণা করে রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে জনসাধারণকে নাবালক করে রাখলে চলবে না। জনসাধারণ যদি সজাগ না থাকে তবে বিশেষ গোষ্ঠী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে থাকে এবং পরিণামে জনসাধারণের স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটে। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, আরব রাষ্ট্রসমূহ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে এটি দেখা যায়। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও পরোক্ষভাবে বণিক শ্রেণীর হাতের মুঠোয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইতিহাসের দর্শন

ইতিহাসের মূল কথা কি ?

অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কার্ল জেস্‌পার্স বলেছেন—"The apprehension of history as a whole leads beyond history. The unity of history is itself no longer history. To grasp this unity means to pass above and beyond history into the matrix of this unity, through that unity which enables history to become a whole... We do not live in the knowledge of history, in so far, however, as we live by unity we live supra historically in history." (The Origin and Goal of History, p. 275). চিন্তাধারাটি নতুন নয়। বহুকাল আগে থেকেই বিভিন্ন ঐতিহাসিক ইতিহাসের তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করেছেন। ইতিহাস কি ঘটনাবলীর নিছক বিবরণ, অথবা শক্তিশালী নৃপতির প্রশস্তি, কিংবা বিশ্বমানসের ক্রমবিকাশের ধারা ? প্রাচীন যুগের শিল্পধর্মী ইতিহাসের দার্শনিক রূপে পরিবর্তন ঘটেছিল মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের হাতে ; বর্তমান যুগে ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক স্তম্ভের ওপর।

ইতিহাস-চেতনার নিদর্শন পাওয়া যায় সুপ্রাচীনকাল থেকেই ; ঋকবেদ, উপনিষদ, পুরাণসমূহ ইত্যাদি গ্রন্থে একদিকে যেমন সুবিস্তৃত বংশতালিকা রয়েছে, তেমনি আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বর্ণনা করে ঘটনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে সমাজ-জীবনের রীতিনীতি-আদর্শের পরিচয় দিয়ে ইতিহাসের রূপকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসেও এই ধারার অনুসরণে ইতিহাস রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়, দেখা যায় প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলোনীয়াতেও।

কিন্তু ইতিহাসের মূল কথা কি ? ইতিহাস মানুষকে কি শিক্ষা দেয় ? ইতিহাস কি সরল নির্ধারিত পথে চলে অথবা যুক্তিহীন কুটিল পথে ? এই প্রশ্নে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মত। সাহিত্যধর্মী শিল্পরসে রঞ্জিত

ইতিহাসের নিদর্শন যেমন দেখা যায় ভারতের চারণ কবিদের মধ্যে, তেমনি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক লিভি, কার্লাইল, ট্রেভেলিযান, একটন প্রমুখের মধ্যে তাঁদের মতে ইতিহাসের উদ্দেশ্য জাতিগঠন। হোমারের মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে একদিন যেমন অজেয গ্রীকজাতির সৃষ্টি হযেছিল, বিংশ শতাব্দীতে তেমনি টিউটন জাতিতত্ত্বের অনুসরণে লিখিত ইতিহাসকে আশ্রয় করে জেগে উঠল দুর্বাব জার্মান জাতি। হেবোডোটাস ইতিহাসকে সাহিত্যের অঙ্গ বলে মেনে নিযেছিলেন। কিন্তু দ্বৈপাযন ব্যাস ও নীৎসে তাকে কবে তুললেন প্রয়োজনধর্মী দর্শন।

হেগেল নিযে এলেন তাব প্রজ্ঞানবাদী সূত্র। তিনি বললেন, যুগ থেকে যুগান্তরে অসংখ্য ঘটনা ও সংঘাতের মধ্য দিযে বিশ্বপ্রজ্ঞা স্বীয মুক্তিব দিকে ছুটে চলেছে। যুগ-সমস্যাব সমাধানে সে উত্থাপিত করে একটি প্রস্তাব। সেই প্রস্তাবের ত্রুটি লক্ষ্য কবে এগিযে আসে বিকল্প প্রস্তাব। পবে উভয প্রস্তাবের সমন্বযে আসে সমাধান। কিন্তু সেই সমাধানও স্থাযী নয, নতুন যুগ-সমস্যায় নতুন প্রস্তাব উত্থাপিত হয এইভাবে প্রস্তাব-দ্বন্দ্ব-মীমাংসাব (Thesis—anti-thesis—synthesis) অবিবাম গতিতে ঘটে বিশ্বপ্রজ্ঞাব ক্রম-উন্মেষ হেগেলেব মতো আর্নল্ড টযেনবীও মনে কবেন যে বিশ্বমানসেব অভিযানই ইতিহাসেব সূত্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য বামানুজেব মতো হেগেলেরও বিশ্বপ্রজ্ঞা চিবচঞ্চল, প্রতি মুহূর্তে সে নিজেকে নানান বৈচিত্র্যে প্রকাশিত করছে। বিপবীত দিকে শঙ্কবাচার্যের মতো এমার্সন ও টযেনবী'ব বিশ্বপ্রজ্ঞা কালোত্তর হযেও কালস্রোতে নিত্য সঞ্চারশীল। ব্যক্তিমানস লিখে চলে ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়। সব কটি অধ্যায় মিলে প্রকাশ করে বিশ্বমানসের প্রকৃতি। বোধের ঐক্য কালের ব্যবধান পার হযে সন্ধান দেয় কালোত্তর বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার।

বিজ্ঞানের চমকপ্রদ উন্নতি মানুষকে চিন্তার অবসর দিল। ইতিহাসের গতিসূত্রকে বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মে বেঁধে ফেলা যায় কিনা। ইতিহাস কি গণিতশাস্ত্রের মতো নির্দিষ্ট নিয়মে চলে? অতীত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ পৃথিবী সম্বন্ধে সঠিক মতামত দেওয়া যায় কি? এ-প্রশ্নে ঐতিহাসিকেরা ভাগ হয়ে গেলেন দুই শিবিরে। ফিশার গরগারি বললেন, যে ইতিহাসের গতির মধ্যে তিনি কোনো সংগতি খুঁজে পাননি। একই কথা

বললেন রাসেল। 'হিস্ট্রি অব এন্টিকুইটিস' বইয়ে এডোয়ার্ড মেয়ার লিখলেন : ঐতিহাসিকের কাজ হল ঘটনাবলীর যথার্থ উপস্থাপন, তা থেকে কোনো নীতি বা মতবাদ খুঁজে বের করা নয়। এ-কথা কিন্তু মানলেন না বহু ঐতিহাসিকই। হেগেলের দ্বান্দ্বিক মতের সাহায্যে কার্ল মার্কস ইতিহাসের গতিসূত্র হিসেবে আবিষ্কার করলেন অর্থনীতিকে। অনুরূপভাবে কিড্ জোর দিলেন ধর্মবোধের ওপর, গোবিনো জাতি বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরলেন, হার্ডার ভৌগোলিক পরিবেশকে, কার্লাইল রাষ্ট্রনায়কদের, ফ্রয়েড যৌন চেতনাকে।

বিবেকানন্দের বক্তব্য

ইতিহাসের গতিসূত্র বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : জড়ের মধ্যে যে চেতনার ক্রমিক পরিচয় লাভ—তাই হল সভ্যতার ইতিহাস।[১] তাঁর মতে, জড়ের বিরুদ্ধে চেতনার সংগ্রাম এবং ক্রমাধিপত্যই হল ক্রমবিকাশের ইতিহাস। বলেছেন তিনি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যা বিদ্রোহ করে তাই চেতন, তাতেই চেতনার বিকাশ হয়েছে। চেতনার আদি অভিব্যক্তি অ্যামিবা। (স্বামীজী বলেছেন, এর আগে চেতনা অব্যক্তাবস্থায় সূক্ষ্মাকারে থাকে, জড়ের মধ্য দিয়ে সে যখন নিজেকে প্রকাশ করে তখনই আমরা সাদা চোখে চেতনার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। নিউ ইয়র্কের এক বক্তৃতায় তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন। দ্রষ্টব্য : বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৭) সেই এককোষী জীব অ্যামিবার অঙ্গ ছিল, কিন্তু কোন প্রত্যঙ্গ ছিল না। তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল বেঁচে থাকার জন্য, খাদ্য সংগ্রহের জন্য, চলার জন্য। প্রকৃতির বিরুদ্ধে, জড়ের বিরুদ্ধে তার এই সংগ্রাম ছিল অব্যাহত। জড়ের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় এর প্রতিটি ক্ষণ ব্যয়িত হত। এই সংগ্রামের ফলেই আবির্ভূত হলো নতুন প্রজাতি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অ্যামিবার চেয়ে সে একটু বেশি শক্তিশালী। সেও করে চললো সংগ্রাম। জড়ের ওপর আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম। প্রকৃতির বিরুদ্ধে, জড়ের বিরুদ্ধে চেতনার এই সংগ্রাম জন্ম দিল নবতর প্রজাতির। এইভাবে নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়ে চলল, আর প্রতিটি প্রজাতিই পূর্ববর্তীর চেয়ে অধিকতর সংগ্রামক্ষম। এই সংগ্রামের তাগিদেই, এই আধিপত্য বিস্তারের তাগিদেই জীবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও আবির্ভাব

হতে লাগল। মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি হতে লাগল। সংগ্রামের ধারা বেয়ে এল মানুষ। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জড়ের ওপর চেতনার ক্রমাধিপত্যের ইতিহাসই ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

বহু কোটি বছর ধরে প্রাণিজগতের যে বিকাশ চলছিল দৈহিক স্তরে, মানুষের আবির্ভাবের পর তা চলে এল মানসিক স্তরে। প্রস্তর যুগের মানুষ মানসিক স্তরে ক্রমবিকাশ লাভ করেই বিংশ শতাব্দীর মানুষে পরিণত হতে পেরেছে। গাছের ফলমূল আর পশুর মাংস দিয়ে সে তার দেহের খিদে মিটিয়েছে। এরপরই এসেছে মনের খিদে মেটাবার তাগিদ। জীব জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই রয়েছে এই তাগিদ। আর এর ফলেই মানুষ মূলত মনো-সামাজিক জীব। এই মনের খিদে মেটাতেই আদিম মানুষ গুহায় ছবি এঁকেছে, তৈরী করেছে মাটির পুতুল, জানতে চেয়েছে বৃষ্টি কেন পড়ে, ভূমিকম্পে কোন্ দৈত্য মাথা নাড়ে—সমস্ত রহস্যের পেছনেই একটা যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করেছে। সে শিখেছে আগুন জ্বালাতে, গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে ঘর আর কাপড় বানাতে। উদ্দেশ্য ছিল অন্ধকার-বৃষ্টি-রোদ-ঝড়-শীতকে জয় করা, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করা। বহিঃপ্রকৃতিকে মানুষ যত বেশি করে জয় করেছে, তার সভ্যতা ততই উন্নত হচ্ছে। বড় হচ্ছে মানুষ, আর তার সাথে সাথে রহস্য ভেদ করতে চাইছে দূরের ঐ নীলাকাশের, পৃথিবীর, মাটির, জলের, আপনজনের মৃত্যুতে চিন্তা করছে মৃত্যু কি, আর জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি। এভাবেই সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্ম। একদিকে বহিঃপ্রকৃতি, অন্যদিকে অন্তরপ্রকৃতি, এই দুইয়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে করতে এগিয়ে চলেছে মানুষ।

মানুষের এই সামগ্রিক প্রয়াসের মধ্যে যে মূল বৈশিষ্ট্য তা হল সসীম (finite) মানুষ অসীম (infinite) হতে চাইছে। স্বামীজী একেই 'ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রমের চেষ্টা' (attempt to transcend the limitation of senses) বলেছেন।[২] হিমালয়ের চূড়ায় মানুষ কেন ওঠে, কেন সামান্য পাল-তোলা নৌকো নিয়ে সাগর পাড়ি দিতে চায়, কেন রকেট পাঠায় মহাকাশে ? মানুষ তার প্রকৃতিদত্ত শক্তিকে ছড়িয়ে যেতে চায়, সসীম মানুষ অসীম হতে চায়। বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ম-সমাজনীতি-শিল্প-সাহিত্য সব কিছুরই উৎপত্তি ও গতি মানব-মনের এই গভীর আকুতি থেকে। এভাবেই স্বামীজী ইতিহাসের

গতিসূত্রটিকে উদ্ধার করেছেন। জড়ের উপর চেতনার ক্রমাধিপত্যই যখন ইতিহাসের গতি তখন ইতিহাসের ও মানবজাতির লক্ষ্য কি? নিশ্চয়ই এমন এক অবস্থা যেখানে জড়ের ওপর চেতনার পূর্ণাধিপত্য বিস্তার হয়। এই অবস্থাকেই ধর্মীয় পরিভাষায় বলা হয় মুক্তি, আত্মজ্ঞান। স্বামীজী বলেছেন, "তিনি 'যোগী' এমন এক অবস্থায় উপনীত হতে চান, যেখানে আমরা যেগুলিকে 'প্রকৃতির নিয়মাবলী' বলি, সেগুলি তাঁর ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না. সেই অবস্থায় তিনি ঐসব অতিক্রম করতে পারবেন। তখন তিনি অন্তর ও বাহ্য সমগ্র প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব লাভ করবেন। মানব জাতির উন্নতি ও সভ্যতার অর্থ—শুধু এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা।"[৩] এ কারণেই স্বামীজী ধর্মকে সমাজের আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে করেছেন। Practical Vedanta-র তাৎপর্যে তিনি একদিকে যেমন জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধানে মানুষকে উৎসাহিত করেছেন, অন্যদিকে দেখিয়েছেন যে মানব-সভ্যতার গতি ঐ একই দিকে—জড়ের ওপর চেতনার পূর্ণাধিপত্যে।

ইতিহাসের ধারায় বিভিন্ন শক্তি

স্বামীজীর মতে, মানবাত্মার মুক্তি-অভিযানের কাহিনীই হল মানুষের ইতিহাস। তাঁর ভাষায়: "প্রতিটি মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী, শুধু কতগুলি বাধা ও প্রতিকূল পরিবেশ তার ঐ শক্তিপ্রকাশে বাধা দিচ্ছে। যখনই ঐ বাধাগুলি দূর হবে মানুষের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তি তখনই পূর্ণবেগে বেরিয়ে আসবে।"[৪] "প্রকৃতিকে বশীভূত করার জন্য বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পথের আশ্রয় নেয়।"[৫] মানবাত্মার এই মুক্তি অভিযান বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে হলেও "সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিন্দুর প্রাণে মুক্তি লাভেচ্ছারূপে বিকশিত হয়েছে।"[৬]

অন্যান্য ঐতিহাসিকদের থেকে স্বামীজীর এখানেই বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের গতিসূত্র হিসেবে বেবর ও কীড উল্লেখ করেছেন ধর্মবোধকে, গোবিনো ও ভাগনার জাতিবৈশিষ্ট্যকে, হার্ডার ও র‍্যাটজেল ভৌগোলিক পরিবেশকে, কার্লাইল শক্তিশালী ব্যক্তিকে, মার্কস অর্থনীতিকে। ইতিহাসে যে এই

ধর্মবোধ, জাতিবৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক পরিবেশ, শক্তিশালী নেতা, অর্থনীতি ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে সে কথা অস্বীকার করেননি স্বামীজী। বিভিন্ন জায়গায় তিনি বলেছেন :

"এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম, আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে ; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার।"[৭]

"একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরব জাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানীর, এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।"[৮]

"দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করত, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত, যারা সমতল জমিতে তাদের চাষবাস ; যারা পার্বত্যদেশে, তারা ভেড়া চড়াত, যারা মরুময় দেশে, তারা ছাগল উট চড়াতে লাগল, কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস করে, শিকার করে খেতে লাগল।· ক্রমে·· বর্তমান মহা জটিল সমাজ উপস্থিত হল কিন্তু স্বভাব মরেনা।·· যে সমাজে যে দল সংখ্যায় অধিক, সে সমাজের চরিত্র সেই পরিমাণে · হতে লাগল।"[৯]

"ইতিহাস পড়ে দেখ, এক একজন মহাপুরুষ এক একটা সময়ে এক-একটা দেশে যেন কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।"[১০]

"মানুষকে হয় বেঁচে থাকতে হবে, না হয় অনাহারী থাকতে হবে—এই প্রয়োজনই জগতে কাজ করছে, খ্রীস্টান ধর্ম অথবা বিজ্ঞান নয়।"[১১]

স্বামীজী সেজন্য এই মত প্রকাশ করেছেন, বিপুল বৈচিত্র্য ও বর্ণসম্ভারের মধ্য দিয়ে মানবাত্মার যে মুক্তি অভিযান চলে, বহুবিধ শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নানা দিক থেকে অসংখ্য প্রভাব তার মধ্যে পড়ে। হিন্দুদের ধর্মে হাত দিতেই আওরঙ্গজেবের বিরাট মুঘল সাম্রাজ্য শূন্যে বিলীন হলো, ১৮৫৭ সালে ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাসে ইন্ধন দিয়ে সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হলো, ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস জোর করে দেশবাসীর ওপর করভার চাপাতে গেলে পরম রাজভক্ত ইংরেজ রাজার শিরশ্ছেদ করে· উগ্র

জাতীয়তাবাদ দিয়ে হিটলারের জার্মানী নতুন ইতিহাস রচনা করেছিল, একা কামাল পাশাই তুরস্কের ইতিহাসকে বদলে দিয়েছিলেন। ইতিহাসকে তাই মনে হয় খামখেয়ালী। কিন্তু স্বামীজীর সূত্র সামনে রেখে পর্যালোচনা করলে সবকিছুর মধ্যে একটা সঙ্গতি ধরা পড়ে। অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা সমকালীন পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন বিশ্ব-ইতিহাসকে—অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব প্রভাবিত করেছিল কার্ল মার্কসকে, হার্বাট স্পেন্সার প্রভাবিত হয়েছিলেন ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্বের দ্বারা। এদিক দিয়ে স্বামীজী অনন্য।

History repeats itself. স্বামীজী কি এ কথায় বিশ্বাস করতেন? এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "ইংরেজরা মুখে পবিত্র ঈশ্বরের নাম নেয়, প্রতিবেশীকে ভালবাসে বলে দাবী করে, খ্রীষ্টের নামে তারা অন্যদের সভ্য করার কথা বলে। কিন্তু এ সবই মিথ্যা। মানুষের প্রতি ভালবাসার কথা কেবল তাদের মুখে, অন্তরে পাপ আর সবরকম হিংসা ছাড়া আর কিছুই নেই। ঈশ্বর এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেনই। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর সন্ধান করতে হবে। বারে বারে এমনই ঘটেছে, ভবিষ্যতেও এমনই ঘটবে।"[১২] ইতিহাসের গতি চক্রাকার, সঠিকভাবে বলতে গেলে ঘোরানো সিঁড়ির মতো বা বক্রকেন্দ্রিক বৃত্তের মতো। চক্রাকারে আবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বৈশিষ্ট্যগুলি ফিরে ফিরে আসছে ঠিকই, কিন্তু প্রতিবারই নতুন রূপ নিয়ে। গ্যালিলিও-ডারউইনের মুখ বন্ধ করার প্রচেষ্টার পেছনে যে মনোভাব কাজ করছিল, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সলঝেনিৎসিন-শাখারভের কণ্ঠরোধ করার পেছনেও সেই মনোভাবই কাজ করছে, আর তা হচ্ছে স্বাধীন চিন্তা ও কেতাবী বুদ্ধির দ্বন্দ্ব। তৈমুর-চেঙ্গিজের সাথে ১৮-১৯ শতকের য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পার্থক্য কর্মধারায়, চিন্তাধারায় নয়।

এই বিশ্বে শোষণ চলছে প্রাচীনকাল থেকেই। বিভিন্ন রূপে 'বিশেষ অধিকার বাদ' এসে হানা দিয়েছে, আর প্রতিবারই মানুষ তাকে ধ্বংস করে আত্মবিকাশের চেষ্টা করেছে। স্বামীজীর ভাষায়—"সমাজ-জীবন গড়ে ওঠার সময় থেকেই দুইটি শক্তি কাজ করে আসছে—একটি ভেদ সৃষ্টি করছে, অন্যটি ঐক্য স্থাপন করেছে। এদের ক্রিয়া বিভিন্ন আকারে দেখা দেয় এবং বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে এগুলিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু মূল উপাদান সবগুলির মধ্যেই আছে। উপনিষদ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও অন্যান্য মহান ধর্মপ্রচারকের যুগ থেকে সুরু করে আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত নতুন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খায়, এবং নিপীড়িত পদদলিত ও অধিকার-বঞ্চিতদের দাবীতে এই ঐক্য ও সাম্যের বাণীই ঘোষিত হচ্ছে। মানব-প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করবেই।"[১৩] আর, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবাত্মার মুক্তি-অভিযানের নামই ইতিহাস।

ইতিহাসের চারিটি পর্যায়

বিবেকানন্দ মননালোকে কার্ল মার্কসের আবির্ভাবের তাৎপর্য বুঝতে গেলে স্বামীজীর ইতিহাস-চিন্তার তাত্ত্বিক দিকটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ও 'বর্তমান ভারত' এই দুটি বই এবং 'হিস্টরিক্যাল্ এভলিউশন্ অফ ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধটিতে স্বামীজী একদিকে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন সমাজের তুলনামূলক বিকাশধারা ব্যাখ্যা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন কালে ও দেশে রাষ্ট্রশক্তি কোন্ শক্তির হাতে ছিল তা-ও আলোচনা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ব্রাহ্মণ (priests) ক্ষত্রিয় (kings) বৈশ্য (merchants) ও শূদ্র (labourers) এই চারিটি শ্রেণী পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বকালে বিদ্যমান এবং রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনা করছে একাদিক্রমে এই শ্রেণীগুলি। মানুষ তার সভ্যতার বিকাশের পথে যে-সব বাধার সম্মুখীন হয়েছে, তার সমাধান সে করেছে চারটি উপায়ে—জ্ঞানের সাহায্যে, অস্ত্র ও ভূমির সাহায্যে, অর্থের সাহায্যে, কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে। যুগ প্রয়োজনে এক-এক সময় এক-একটি পথ মুখ্য হয়ে ওঠে এবং চারটি শ্রেণীর এক-একটি সেই সমাধানে প্রধান ভূমিকা নেয়। জ্ঞানের সাহায্যে যুগ সমস্যার সমাধান করতে যে শ্রেণী এগিয়ে আসে তারা ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধিজীবী। ক্ষত্রিয়শক্তি এগিয়ে আসে অস্ত্র ও ভূমির সাহায্যে, বৈশ্য অর্থের সাহায্যে, আর শূদ্র কায়িক শ্রমকেই প্রধান করে তোলে। জ্ঞান যে-যুগে প্রধান হয়ে ওঠে সে-যুগে আবির্ভাব হয় বড় বড় বাগ্মী, লেখক, চিন্তাশীল মনীষীর। মানুষ তখন জ্ঞানকেই সর্বোচ্চ সম্মান দেয় এবং চিন্তাশীল লোকেরাই সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান পান। বস্তুত, সমাজব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই জ্ঞানীরাই তখন হন প্রধান নিয়ন্তা। পৌরাণযুগে প্রাধান্য

ঘটে ক্ষত্রিয় শক্তির। মানব সমাজ তখন জ্ঞানচর্চার চেয়ে শৌর্য বীর্যের দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়ে। আর্থিক যুগে উদ্ভব ঘটে বৈশ্য শক্তির। মানুষ তখন অর্থের দিকে ছুটে চলে—বিদ্যাচর্চার মূল উদ্দেশ্য অর্থ, জ্ঞানীরা অর্থনীতির সাহায্যেই সকল সমস্যার সমাধান করতে চান, এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেই সর্বোচ্চ স্বাধীনতা বলে মনে করা হয়। এই বৈশ্য প্রধান যুগের পর শূদ্রযুগ। কায়িক শ্রমকে যারা পেশা করেছে তারাই এ যুগের নিয়ন্তা।

এইভাবে চারটি শক্তির লীলাকেন্দ্ররূপে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে স্বামীজী এক মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। চীন-মিশর-ভারত-ইস্রায়েল প্রভৃতি দেশে প্রাচীন যুগে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল ব্রাহ্মণ শ্রেণীর হাতে। পরবর্তী যুগে সেই শক্তি এল ক্ষত্রিয়দের হাতে। ইউরোপে এই যুগের ক্ষত্রিয় শক্তির পরে সমাজনিয়ন্তা রূপে আবির্ভূত হলো বৈশ্যশক্তি। এই বৈশ্যশক্তির চমকপ্রদ উন্নতি ঘটল অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব। শিল্প বিপ্লব যখন নিত্য নতুন আবিষ্কারে নিজের শক্তি প্রবলভাবে বাড়িয়ে তুলেছে, কার্ল মার্কসের আবির্ভাব সেই আর্থিক যুগে, বৈশ্যশক্তির চরম অভ্যুদয় কালে। মার্কস তাই শিল্প বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত। আর্থিক যুগে তার আবির্ভাব বলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপরেই তাঁর মূল দৃষ্টি। বৈশ্যযুগ শেষ হয়ে আসছে, তাই আগামী শূদ্রযুগের প্রবল সমর্থক ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে তাঁর আবির্ভাব। বিবেকানন্দ-মননালোকে মার্কসের আবির্ভাবের তাৎপর্য এখানেই। শিল্প বিপ্লবের দ্বারা অভিভূত ছিলেন বলে তৎকালীন মূল্যবোধের সাহায্যে কার্ল মার্কস বিশ্বের সকল সমস্যাকে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন।

স্বামীজী শূদ্র-অভ্যুত্থানকে আবাহন জানিয়েছিলেন সমগ্র অন্তর দিয়েই, কিন্তু মার্কসের মতো কেবল এই শূদ্রশক্তিকে কেন্দ্র করেই স্বীয় বক্তব্য গড়ে তোলেননি। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারিটি শ্রেণীর মধ্যে স্বামীজী দেখতে পেয়েছিলেন সামাজিক ক্রিয়াকলাপের চারিটি মৌল শক্তি। নতুন পৃথিবীর আবাহনে তাই তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন এই শক্তিগুলির কল্যাণকর দিকগুলি যাতে সম্মিলিত হতে পারে। এই শক্তি-নেতৃত্ব সমূহের ভাল-মন্দ দুটি দিকই তিনি তুলে ধরেছিলেন এবং এদের ভাল দিকগুলির সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে আগামী পৃথিবীকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১-১১-১৮৯৬ তারিখে একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন, "মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি শ্রেণীর

যারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেক রাষ্ট্রে দোষ গুণ দুই-ই আছে। পুরোহিত শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাদের ও তাদের বংশধরদের অধিকার রক্ষার জন্য চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে, তারা ব্যতীত অন্য কারোর বিদ্যাশিক্ষার অধিকার নেই, বিদ্যাদানেরও অধিকার নেই। এ-যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ-সময়ে বিভিন্ন জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়, কারণ বুদ্ধি বলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতেরা চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন। ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদারমনা নন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।·তারপর বৈশ্য শাসন যুগ। এর ভেতরে ভেতরে শরীর নিষ্পেষণ ও রক্ত শোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব —বড়ই ভয়াবহ! এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চারদিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগের চেয়ে বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় থেকেই সভ্যতার অবনতি শুরু হয়।·· সবশেষে শূদ্রশাসন যুগের আবির্ভাব হবে। এ-যুগের সুবিধা হবে এই যে এ সময়ে শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা হলো, হয়তো সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার প্রসার খুব বাড়বে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালীর সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।· যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় রাখবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব?"[১৪]

আদর্শ রাষ্ট্রের সন্ধান দিয়েই স্বামীজী কেন মন্তব্য করলেন—'কিন্তু এ কি সম্ভব'? আসলে, মানুষ যতদিন স্থূলদেহ আর পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর ভিত্তি করে সমাজ গড়তে চায় ততদিন সেই সমাজের ধ্বংসের বীজ থাকে তার মনের মধ্যেই, স্বাভাবিক ছয় রিপুর অন্তরালে। নিজের মনের ওপর মানুষ যতক্ষণ না তার বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখছে, ততক্ষণ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ মাৎসর্যের আকর্ষণে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকেই। স্তালিন-ক্রুশ্চেভ-লিনপিয়াও-পলপট ও চার চক্রের (চীনের গ্যাং অব্ ফোর) পরিণতি এই

আশংকাকেই প্রমানিত করে। এর সমাধানে স্বামীজী দুটি উপায়ের নির্দেশ দিয়েছেন—বৈদান্তিক নীতিবাদ যা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করব, এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে জনসাধারণকে সব সময় সচেতন রাখা।

মার্কস প্রলেতারিয়েত ডিক্টেটরশিপের কল্যাণকর রূপটিই শুধু দেখতে পেয়েছিলেন। এর যে অন্ত দিকও থাকতে পারে সে-কথা তার মনে আসেনি। এই ভুল স্বামীজী করেন নি। বর্তমান কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকালেই আমরা স্বামীজী কথিত ভাল-মন্দ দিকগুলির তাৎপর্য বুঝতে পারি। ঐ দেশগুলিতে আজ সাধারণ শিক্ষা ও খাওয়া-পরার সুবিধে আগের চেয়ে বেড়েছে, কিন্তু দার্শনিক চর্চা সেখানে নেই বললেই চলে। যা-ও বা আছে তা মার্কসীয় ভাষ্য রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানের চমকপ্রদ উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যে-স্তরে দার্শনিক হয়ে যান (যেমন জেম্‌স্ জীন্‌স্, আইনস্টাইন্, শ্রডিন্‌জার, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হাইজেনবার্গ প্রমুখ) সেই মনোভাব ঐসব দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া সরকারী বিধিনিষেধের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য ভালভাবে বিকশিত হতে পারছেনা। এদিকে তাকিয়েই সল্‌ঝেনিৎসিনের কাতরতা—"Allow us a free art and literature, the free publication…allow us philosophical, ethical, economic and social studies, and you will see what a rich harvest it brings and how it bears fruit—for the good of Russia…let the people breathe, let them think and develop!" (Letter to Soviet Leaders, pp. 56-7)

শূদ্র শাসনে অপসংস্কৃতির সম্ভাবনা স্বামীজী কেন আশঙ্কা করেছিলেন? তিনি মনে করতেন, যুগ যুগ ধরে শূদ্রদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তারই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অতীতের সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক ধারার ওপর এরা আক্রমণ চালাবে। ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তা অবিলম্বে পূরণ করা সম্ভব হবে না।[১৫] চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব স্বামীজীর এই আশঙ্কাকেই সত্য বলে প্রমাণিত করছে। রাশিয়াতেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এই ঝোঁক দেখা গিয়েছিল, প্রলেত-কাল্ট্ নামে আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। লেনিন তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন বলেই রাশিয়া এই বিপদ থেকে প্রাথমিকভাবে কিছুটা রক্ষা

পেয়েছিল। স্তালিন-যুগের 'ব্যক্তিপূজা' থেকে বর্তমানে ব্রেজনেভের 'সীমাবদ্ধ সার্বভৌমতা'র নীতি ঐ অপসংস্কৃতিকেই জীবনদান করছে।

স্বামীজী শূদ্রযুগকে ইতিহাসের শেষ যুগ বলে মনে করতেন না। তিনি বলেছেন, এর পর আবার ব্রাহ্মণ-আদর্শ নবরূপে দেখা দেবে। কিভাবে? জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে জনসাধারণের ঘুম ভাঙলে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা ব্যবস্থা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। অতীত যুগের চেয়ে তারা আরও বেশি করে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে চাইবে। সেই সাথে কারিগরী শিল্পের উন্নতি ঘটার ফলে মানুষের অধিকাংশ কাজ যন্ত্রই (machine) করে দেবে। ধীরে ধীরে বেগারখাটা শ্রম থেকে মুক্ত হয়ে জনসাধারণ ক্রমশঃ বিদ্যাচর্চার দিকে বেশি নজর দেবে এবং মুক্তচিন্তার ধারা বেয়ে জীবন-রহস্যের সমাধান করতে চাইবে। এর ফলে ধর্মদর্শন ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপকতা দেখা দেবে। জ্ঞানচর্চার এই প্রসারতা সমাজে যে পরিবর্তন আনবে, তা সমাজের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে চিন্তাশীল মনীষীদের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলবে। এইভাবে নতুন রূপে আবার ব্রাহ্মণ শাসন দেখা দেবে। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বারবার এই চক্রাকার আবর্তন ও বিবর্তন ঘটে চলবে সমাজের বুকে।

বিভিন্ন মার্কসবাদী দেশগুলির দিকে তাকালে আমরা স্বামীজীর মতের যৌক্তিকতা বুঝতে পারব। ঐসব দেশের সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশই স্বাধীন চিন্তার পক্ষে সংগ্রাম জোরদার করছেন। রাশিয়ার সাহিত্যিকেরা বিভিন্ন গল্প-কবিতা-উপন্যাসের মাধ্যমে এই মুক্ত মনের স্বপক্ষে গোপনে প্রচার করে যাচ্ছেন। মান্দেলস্তাম, ম্যাক্সিমভ, শালামভ, ইয়েভতুশেংকো, পাস্তেরনেক প্রমুখের লেখা ইতিমধ্যেই রুশ নেতৃবৃন্দের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জোরিন, আলেক্সিভ,আমালরিক, শাখারভ প্রমুখ তাঁদের বইতে যে বক্তব্য প্রচার করছেন, তার মূল কথা হলো জনসাধারণকে দেশের শাসন-ব্যাপারে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। শাখারভ, শাকারেভিচ, পোদিয়াপোলস্কি প্রমুখ বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিজীবীরা মিলে রাশিয়াতে 'কমিটি ফর হিউম্যান্ রাইট্স্' গঠন করেছেন যার সাহায্যে তাঁরা গণচেতনাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছে 'উদার-

নৈতিক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্ঘ'। Znak এবং Wiez পত্রিকা দু'টির মাধ্যমে যে মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছেন তার মোদ্দা কথা হলো, জাতীয় জীবন ও সমাজের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। পোল্যাণ্ড সরকার এই উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের লেখা বই পাঁচ হাজার কপির বেশি ছাপাতে অনুমতি দেন'না, যদিও এই বুদ্ধিজীবীরা এই সংখ্যাকে ৪০/৫০ হাজার করতে দেবার দাবী জানিয়ে যাচ্ছেন। চেকোশ্লোভাকিয়াতে ১৯৫০ সালে রুশ আগ্রাসনের মূল লক্ষ্য ছিল চেক্ উদারনৈতিকদের স্তব্ধ করে দেওয়া। ঐসব উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা তৎকালীন চেক্-সরকারের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ১৯৬৩ সালে অন্দ্রেজ কোপ্‌কক্ রাষ্ট্রশাসনে উদার-নীতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন; '৯৬৫ সালে মার্কসবাদী তাত্ত্বিক জুলিয়াস স্ত্রিংকা শাসনতন্ত্রে বিরোধী দলের আবশ্যকতা তুলে ধরলেন এবং জদেনেক স্লাইনার World Marxist Review পত্রিকায় (ডিসেম্বর '৬৫ সংখ্যায়) Theory and Practice of Building Socialism প্রবন্ধে বিভিন্ন বিরোধী দলের আবশ্যকতা তুলে ধরেন।

নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের তত্ত্ব

মার্কস যে বলেছিলেন 'সাম্যবাদী সমাজ ইতিহাসের শেষ স্তর' তা যুক্তিযুক্ত নয়। মার্কস এখানে পূর্ণতাবাদী হয়ে উঠেছেন। যদিও তিনি নিজের মতকে বস্তুনিষ্ঠ বলে দাবী করেছেন, তবুও অত্যধিক যান্ত্রিক ব্যাখ্যার ফলে তাঁর মত ভাববাদী হয়ে পূর্ণতাবাদের কথাই প্রচার করেছে। কারণ এই মতে সাম্যবাদী সমাজ ত্রুটিহীন সমাজ। আসলে, মার্কসের principle of linear progress তত্ত্বটিই অবৈজ্ঞানিক। সমাজ কখনও সরলরেখায় চলেনা, ঢেউয়ের আকারে বৃত্তাবর্ত্তে তার গতি।

স্বামীজী কথিত বিপ্লব তাই কোনো এক জায়গায় পৌঁছে থেমে যাবে না, এই তত্ত্বকে নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের তত্ত্ব বলা যায়। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী মনীষী। আর তাই তিনি বুঝেছিলেন যে রামরাজ্য বা সুখময় পৃথিবী কল্পনার বিষয় মাত্র। তাঁর ভাষায়—"বাস্তব জগৎ সব সময়ই ভাল-মন্দের মিশ্রণরূপে থাকবে।...বস্তুজগতে প্রত্যেক ঢিলটির সঙ্গে পাটকেলটি চলে—প্রত্যেক ভালটির সঙ্গে মন্দটিও ছায়ার মতো আছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে

ঠিক সমস্তরের অবনতিও সংযুক্ত হয়ে রয়েছে।…একটি ভুল আমরা প্রতিনিয়তই করে থাকি, তা হলো ভাল জিনিসটিকে আমরা ক্রমবর্ধমান বলে মনে করি, কিন্তু মন্দ জিনিসটার পরিমাণ নির্দিষ্ট বলে ভাবি। তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করি যে, প্রতিদিন কিছু কিছু করে মন্দের ক্ষয় হয়ে এমন এক সময় আসবে যখন কেবলমাত্র ভালটিই অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি ভ্রমাত্মক, কারণ এটি একটি মিথ্যা যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। জগতে যদি ভালটি বেড়েই চলেছে তাহলে মন্দটিও বাড়ছে।"[১৬]

রাষ্ট্রকে তাই স্বামীজী necessary evil বলেই ধরেছেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র শাসনে রাষ্ট্রের ভাল-মন্দ দিকগুলি সবিস্তারে আলোচনা করে এই সবের মধ্যে যে তত্ত্বটি দেখতে পেয়েছেন তা হলো—"সমাজ জীবন গড়ে ওঠার সময় থেকেই দুটি শক্তি কাজ করে আসছে—একটি ভেদ সৃষ্টি করছে, অন্যটি ঐক্য স্থাপন করছে। এদের ক্রিয়া বিভিন্ন আকারে দেখা দেয় এবং বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে একে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।…সমগ্র বিশ্ব—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এবং ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের ক্রীড়াক্ষেত্র, সমগ্র জগৎ—সাম্য ও বৈষম্যের খেলা;…অধিকার বিলোপ আমরা নিশ্চয়ই ঘটাতে পারি। সমগ্র জগতের সামনে এটাই যথার্থ কাজ। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের সামাজিক জীবনে এটাই একমাত্র সংগ্রাম। এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর লোকের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হতে পারে, এটা আমাদের সমস্যা নয়। আমাদের সমস্যা হলো, বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে এরা অল্পবুদ্ধিদের কাছ থেকে তাদের দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও কেড়ে নেবে কিনা! এই বৈষম্যকে ধ্বংস করার জন্যই সংগ্রাম।… এই অধিকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলে আসছে। অন্যকে বঞ্চিত করে নিজে সুবিধা ভোগ করার নামই অধিকারবাদ, এবং যুগযুগান্ত ধরে নীতিধর্মের লক্ষ্য এই অধিকারবাদকে ধ্বংস করা। বৈচিত্র্যকে নষ্ট না করে সাম্য ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ।"[১৭]

হেগেল যেমন মনে করেছিলেন যে প্রুশীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সাথে সাথে সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ থেমে যাবে। মার্কসও কমিউনিষ্ট সমাজ সম্বন্ধে তা-ই মনে করেন। এরা কেউ বুঝতে পারেননি যে মানুষের নিজস্ব একটি সত্তা আছে যা সব সময় পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই তারা ভেবেছেন, পরিবেশ আদর্শ হলেই মানুষের মনও চিরসুখী হয়ে যাবে। তারা এটিও

বুঝতে পারেননি যে সুখ বিষয়টি আপেক্ষিক, একই বিষয় সবাইকে সুখী করতে পারে না। তাছাড়া, মানব সভ্যতার প্রতিটি অবদান পুরোনো সমস্যার সমাধান করার সাথে সাথে নতুন সমস্যাও নিয়ে আসে। স্বামীজী এই মৌলিক সত্যগুলি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই 'রামরাজ্য'কে অলীক কল্পনা বলে ধরেছেন। প্রকৃত বাস্তববাদীর মতোই তিনি বুঝিয়েছেন যে স্বর্গরাজ্যের কল্পনা কল্পনাই।[১৮]

তবে স্বামীজী বিপ্লবের কথা বলেছেন কেন? স্বর্গরাজ না এলেও মানুষ চিরদিনই চাইবে সুন্দর, আরও সুন্দর সমাজ তৈরী করতে। এ-জন্যই স্বামীজী বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। সুন্দর সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে বৈপ্লবিক কাজ চালিয়ে যেতে হবে। পুরণো সমস্যার সমাধানে যেমন বর্তমানে এক-ধরণের বিপ্লব চাই, তেমনি ভবিষ্যতে নতুন সমস্যার জন্য দরকার হবে নতুন ধরণের বিপ্লব। এ ভাবে বিপ্লব চলবে অবিরামভাবে, যতদিন মানুষ থাকবে। বিপ্লবের মূল লক্ষ্য কিন্তু মানুষ। বৈপ্লবিক পরিকল্পনার সময় যে মৌলিক প্রশ্নটি চোখের সামনে রাখতে হবে তা হলো এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি মানুষের উন্নতি, না উৎপাদন বিজ্ঞান-সংস্থাগুলির উন্নতি? চলতি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আগে-থেকে-করা পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া দরকার, অথবা ভবিষ্যতকে রূপায়িত করা—বৈপ্লবিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যটা কি? সেই মৌল প্রত্যয়গুলি কি যা আমাদের পরিকল্পনার পেছন থেকে আমাদের পরিকল্পনা করতে বাধ্য করে? মানুষের সৃজনী শক্তি কি অবাধভাবে এগিয়ে যাবে? এ ধরণের নানান মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন স্বামীজী। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর কয়েকটি উক্তি তুলে ধরা যাক। "সকল জ্ঞান লাভের দুইটি মূলসূত্র আছে। প্রথমত, বিশেষকে (particular) সাধারণে (general) এবং সাধারণের আবার সার্বভৌমে (universal) তত্ত্বে সমাধান করে জ্ঞান লাভ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, যে কোন বস্তু ব্যাখ্যা করতে হলে যতদূর সম্ভব সেই বস্তুর স্বরূপ (essential nature) থেকেই তার ব্যাখ্যা করতে হবে।"[১৯]

"তোমরা যাকে উন্নতি বলো সেটি তো বাসনারই ক্রমাগত বৃদ্ধি।"[২০]

"বাস্তবিক সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি? এগুলি তো ক্রমাগত বিভিন্ন রূপ ধারণ করছে।...প্রত্যেকের সুখের ধারণা আলাদা আলাদা।"[২১]

"আমরা যে-সব বিষয় আগে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করেছি এমন কতগুলি

বিষয়ের তুলনার প্রণালীকে 'যুক্তি' বলে।"২২

উপরোক্ত উক্তিগুলি থেকেই বোঝা যায় নতুন বৈপ্লবিক পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার আপাত উদ্দেশ্য কোন চিরন্তন ব্যাপার হতে পারে না, বরং স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী এদের পরিবর্তন হতে বাধ্য। কোন বিশেষ সমাজ বা পরিবেশকে আদর্শ বলে চিহ্নিত করার চেয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে মানুষের প্রতি। অর্থাৎ, মানুষের নতুন নতুন অভিব্যক্তির তার অন্তহীন সম্ভাবনার দরজা খোলা রাখতেই হবে।

মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য দুই ধরণের। একদিকে এই স্বাস্থ্য মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতির সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়, অন্যদিকে সামাজিক সম্পর্ককে সুষ্ঠু করে তোলে। এই ব্যৈক্তিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের মাঝে কিছুটা মিল কিছুটা পার্থক্য আছে। একটি রুগ্ন সমাজে একজন মানুষ সুষ্ঠভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তখনই যখন তার বৈক্তিক মানসিক স্বাস্থ্য রুগ্ন থাকে। আবার এই রুগ্ন সমাজেই সুস্থ মানুষ বিদ্রোহ করে—কখনও রাজনৈতিক কর্মী হয়ে, কখনও শিল্পী-সাহিত্যিক হয়ে (বার্নার্ড শ'র মতো), কখনও বা হিপি হয়ে। নিখুঁত সুস্থ সমাজ কি সম্ভব? এর উত্তর 'হ্যাঁ' এবং 'না' দুই-ই। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে আমরা তাকেই সুস্থ সমাজ বলব যেখানে মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনার দরজা খোলা। এই দিকে তাকিয়ে আমরা এ-ধরণের একটি সমাজ কল্পনা করতে পারি। এবারে আসছে এর বাস্তব রূপদানের কর্তব্য। সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে দেখতেই পাচ্ছি যে এই বাস্তব রূপটা ঠিক কি-রকম হবে সে-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। গান্ধী, মার্কস, রাসেল, শ, জয়প্রকাশ এঁরা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সহমত হয়ে বাস্তব ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে ভিন্ন মতের পোষক। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, প্রতিদিন মানুষ নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছে, পুরনো ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। মানুষের এই যুক্তি ও অভিজ্ঞতা কোনো একটি বিশেষ জায়গায় থেমে থাকতে পারে না। থেমে গেলে তা হবে মানব সভ্যতার অপমৃত্যু। মানুষ যেহেতু যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকেই এগিয়ে চলে এবং যেহেতু এই যুক্তি ও অভিজ্ঞতা নিত্য নতুন বর্ণ বৈচিত্র্যের সমারোহে উজ্জ্বল, সেহেতু মানুষের কল্পনারও পরিবর্তন ঘটে, সে চায় সুন্দর আরও সুন্দর সমাজ তৈরী করতে। এদিকে তাকিয়েই স্বামীজী নিরবিচ্ছিন্ন

বিপ্লবের তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। গান্ধী বা মার্কসের মতো আদর্শ সমাজ ও বৈপ্লবিক পথের খুঁটিনাটির ওপর জোর না দিয়ে স্বামীজী তাই কতগুলি মৌল তত্ত্বের সন্ধান দিয়ে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে মানুষের মন সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দেয়, সামাজিক মৌলশক্তিগুলি কি কি, মানুষ ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মানবীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য কি। এইভাবে তিনি মানুষের সামনে সম্ভাবনার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে আহ্বান করেছেন মানুষকে নিজের ভাগ্য নিজে তৈরী করতে।

ইতিহাসের অগ্রগতি

বিপ্লবের সাথে ইতিহাসের অগ্রগতির একটা সম্পর্ক আছে। বিপ্লবের উদ্দেশ্যই হলো ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্কটা হলো ভাষা ও ব্যাকরণের সম্পর্কের মতো। ভাষা শিখতে ব্যাকরণ দরকার হয়, কিন্তু ভাষা সব সময়ই ব্যাকরণ অনুসারে গড়ে ওঠে না। সমাজবিজ্ঞানের একটি কার্যকরী পন্থা হলো বিপ্লব। তাই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে বিপ্লব পথভ্রষ্ট হবেই। তাই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্কে স্বচ্ছধারণা থাকা দরকার যা বিপ্লবের লক্ষ্য ও পথ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারা পরিস্ফুট করবে।

'ইতিহাসের অগ্রগতি' কথাটার অর্থ কি? কাল বিবর্তনে নানান পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতা কি এগিয়ে চলেছে, অথবা কখনও এগিয়ে কখনও পিছিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতার পরিচয় দিচ্ছে? এই গতি কি সরলরেখায়, আঁকাবাঁকা পথে, অথবা চক্রাকারে? সুদূর অতীত থেকেই এসব প্রশ্নে নানা মুনির নানা মত। কোঁতে ও স্পেনসার বলেছেন, মোটামুটি সরলরেখায় মানবসভ্যতা এগিয়ে চলেছে। মার্কসবাদীরাও একই কথা বলেছেন, যদিও হেগেলীয়ান ডায়ালেকটিকসের সূত্র ব্যবহার করে এই গতিতে কিছুটা আঁকাবাঁকা চরিত্রের উপস্থিতি স্বীকার করে নিয়েছেন। সোরোকিন বলেছেন চক্রাকার পথের কথা, আর মার্কিন ঐতিহাসিক জর্জ আইগার্স তো 'অগ্রগতি' ধারণাটি নিয়েই প্রশ্ন তুলে বললেন, অগ্রগতি এখনও পর্যন্ত একটি অনুমান মাত্র এবং তাও রীতিমতো সংশয়াচ্ছন্ন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে —এ প্রসঙ্গে স্বামীজী কোন মত উপস্থাপিত করেছেন?

এটি নিয়ে আলোচনার আগে আমাদের জানতে হবে মানব সভ্যতার বিকাশ বলতে কি বোঝায়, সামাজিক পরিচালিকা শক্তিগুলি কি কি, এবং সমাজের উন্নতি অবনতির অর্থই বা কি। এখানে স্বামীজীর তিনটি মত মনে রাখতে হবে। প্রথমত, জাতি বৈশিষ্ট্য, মনস্তত্ব ধর্মবোধ, ভৌগোলিক পরিবেশ, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত, সমাজের মৌল শক্তিগুলি হলো জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ ও কায়িক শ্রম। এই চারটি শক্তি সমাজের মৌল কাঠামোকে (বেসিক স্ট্রাকচার) ধরে রেখেছে ; আর ভৌগোলিক পরিবেশ, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, উৎপাদনের হাতিয়ার ইত্যাদি শক্তিগুলি হলো সমাজের বাহ্যিক কাঠামোগত (সুপার স্ট্রাকচার) শক্তি। তৃতীয়ত, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কে ঐক্য অনৈক্য দুই-ই আছে। ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে সমাজেরই অঙ্গ এবং সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় সেও প্রভাবিত হয়. আবার সেই ব্যক্তি-মানুষই সমাজ নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সামাজিক পরিবেশ, সামাজিক সংস্থা, সামাজিক আইন-কানুন ব্যক্তির ওপর প্রভাব ফেলে, কিন্তু এইসব সামাজিক পরিবেশ, সংস্থা. আইন গড়ে তুলেছে কে ? মানুষই তো ? ব্যক্তি-মানুষ একদিকে যেমন সামাজিক পরিবেশে প্রভাবিত হয়, জয়ে আনন্দিত পরাজয়ে বিষাদগ্রস্ত হয়, অন্যদিকে সেই ব্যক্তি মানুষই এই জয় পরাজয় আর সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার নিরপেক্ষ হয়ে দেখতে পারে, মননশীলতার সাহায্যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। মানুষের দুটি দিক—সামাজিক ও ব্যৈক্তিক। একদিকে সে সামাজিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, অন্যদিকে সে সামাজিক ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধ থেকে স্বাধীন হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ্লবীদের আবির্ভাব এভাবেই হয়েছে।

দার্শনিক হেগেল-এর ত্রিভঙ্গ ন্যায়প্রণালী অনুসরণ করে মার্কস ও অন্যান্য কয়েকজন সমাজতান্ত্রিক সামাজিক বিকাশে এর কার্যকারিতা খুঁজেছেন। স্বামীজীর মতে এই ডায়ালেকটিকস মতাদর্শগত ক্ষেত্রে কিছুটা প্রযোজ্য হলেও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রূপটি অন্য রকম। এই সামাজিক পরিবর্তনে স্বামীজী যে দুটি রূপ লক্ষ্য করছেন তা হলো সঙ্কোচন (সেন্ট্রালাইজেশন) ও প্রসারণ (ডিসেন্ট্রালাইজেশন)। সামাজিক মৌলশক্তি যখন কোন গোষ্ঠীর

হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, সমাজ তখন সঙ্কুচিত হয়, এবং এই গোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে যখন ওই শক্তি সঞ্চারিত হয় তখন সমাজের প্রসারণ ঘটে। প্রাচীন ভারত, মিশর, ব্যবিলন জ্ঞানচর্চায় প্রভূত উন্নতি করেছিল। কিন্তু পুরোহিতেরা পরে এই জ্ঞানচর্চাকে একচেটিয়া অধিকারের বিষয় করে তুললে সামাজিক মৌল শক্তি 'জ্ঞান' কেন্দ্রায়িত হয়ে ওঠে। আর তাই দেখি, ব্রাহ্মণ বাদরায়নের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ শূদ্রদের সামনেও জ্ঞানের অসীম ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিলেন। এইভাবে কেন্দ্রায়িত জ্ঞান বিকেন্দ্রায়িত হয়ে সমাজে পরিবর্তন এনেছিল। ক্ষত্রিয়েরা এই পরিবর্তন আনলেও কালপ্রবাহে সামন্তপ্রথা ও ক্ষত্রিয়-সাম্রাজ্যবাদের সংকীর্ণতায় আরেকটি সামাজিক মৌল শক্তি 'শৌর্য'কে কেন্দ্রায়িত করল স্বীয় স্বার্থে। জ্ঞান ও শৌর্যের কেন্দ্রীকরণের এই চেহারা আমরা দেখি মধ্যযুগীয় ইউরোপেও, যথাক্রমে পোপতন্ত্রে এবং ফিউডাল লর্ডদের মধ্যে। ইওরোপীয় রেনেসাঁর আবির্ভাব এরই প্রতিবাদে। 'সবার জন্য স্বাধীনতা' বাণীর মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও শৌর্য বিকেন্দ্রায়িত হলো সমগ্র সমাজে। পরে এই স্বাধীনতার অজুহাতেই বৈশ্য সম্প্রদায় চেষ্টা করল আরেকটি সামাজিক মৌল শক্তি 'অর্থকে' স্বীয় গোষ্ঠীতে কেন্দ্রীভূত করতে। এরই প্রতিবাদ দেখি শূদ্র জাগরণে মার্কস-এঙ্গেলস এখানেই থেমে গেছেন, কিন্তু স্বামীজী থামেননি। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের প্রথম মনীষী যিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছেন আবার সেই সাথেই বলেছেন যে সমাজতন্ত্র শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়।[২৩] প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন, শূদ্র-জাগরণের ফলে সমাজের যে প্রসারণ ঘটবে তা কালপ্রবাহে আক্রান্ত হবে নব বুর্জোয়াদের দ্বারা। শূদ্রশক্তির দোহাই দিয়ে এই নব বুর্জোয়ারা [সমাজ-সাম্রাজ্যবাদী, হঠকারী বামপন্থী, বা শোধনবাদী. যে নামই দেওয়া হোক না কেন] ক্রমে সামাজিক শক্তিগুলিকে কেন্দ্রায়িত করবে স্বীয় স্বার্থে। স্বামীজীর ভাষায়, "Slaves want power only to make more slaves" [বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৩য় খণ্ড ৪৯০ পৃঃ]

অতএব স্বামীজী-কথিত 'ইতিহাসের গতি' আলোচনার সময় আমাদের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে :

(১ সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মৌল শক্তি চারটি—জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ, কায়িক

শ্রম। আর ভৌগোলিক পরিবেশ, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, উৎপাদনের হাতিয়ার ইত্যাদি শক্তিগুলি সমাজের বাহ্যিক কাঠামো।

(২) সমাজ দাঁড়িয়ে আছে ব্যক্তিসমূহের ওপর। ব্যক্তিমানুষ প্রাথমিকভাবে সমাজ-নিয়ন্ত্রিত হলেও সামাজিক ধ্যান ধারণা মুক্ত হলে সে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে।

(৩) সামাজিক মৌল শক্তিগুলি কোন গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রায়িত হলে সমাজ সঙ্কুচিত হয়, আর শক্তিগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিকেন্দ্রায়িত হলে সমাজ প্রসারিত হয়।

এখন প্রশ্ন হল—সমাজের মৌল কাঠামোগত শক্তিগুলির সাথে বাহ্যিক কাঠামোগত শক্তিগুলির পার্থক্য কি? মৌল কাঠামোগত শক্তিগুলি সমাজের গতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে, আর বাহ্যিক কাঠামোগত শক্তিগুলি সমাজের গতিকে প্রভাবিত করে পরোক্ষভাবে। জ্ঞান শৌর্য, অর্থ ও কায়িক শ্রম যদি সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত না হয় তবে সমাজ একটা বিস্ফোরক অবস্থায় এসে পৌছোয়। কিন্তু বাহ্যিক কাঠামোগত শক্তি সর্বত্র সঞ্চারিত না হলেও সমাজ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিকাশিত হতে পারে।

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক। উৎপাদনের হাতিয়ার বা উৎপাদিকা শক্তি মার্কসের মতে মৌল কাঠামোগত শক্তি হলেও স্বামীজীর মতে এটি বাহ্যিক কাঠামোগত শক্তি। জারের রাশিয়া এবং বৃটিশ ভারতের উৎপাদিকা শক্তি তৎকালীন পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে অনেক পিছিয়ে থাকলেও এই দুটি দেশে সে সময়ে বড় বড় লেখক, চিন্তাবিদ, শিল্পী ও বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছিল। বিপরীত দিকে বিশাল উৎপাদিকা শক্তি নিয়েও বর্তমান পাশ্চাত্য জগৎ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। এতেই বোঝা যায় উৎপাদিকা শক্তি সমাজের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলতে পারে না। তাই উৎপাদিকা শক্তি হল সমাজের বাহ্যিক কাঠামোগত শক্তি। মৌলিক কাঠামোগত শক্তি সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। প্রাচীন ইউরোপে গ্রীস ও রোমের অভিজাত-বর্গ অর্থকে স্বীয় গোষ্ঠীর করায়ত্ত করলে সেই সভ্যতার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে ক্যাথলিক পোপ জ্ঞানকে কেন্দ্রীভূত করার পর ধর্মীয় সাহিত্যে কোন উন্নতি তো হলই না, বরং জনসাধারণের ধূমায়িত অসন্তোষ গড়ে তুলল প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ। বাইবেলের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন

কোনও সংবাদ প্রচার করতে দিতেন না পাপ।

ইতিহাস প্রসঙ্গে স্বামীজী আরেকটি উল্লেখযোগ্য মত প্রকাশ করেছেন এই যে ইতিহাস একটি বিমূর্ত সত্তা নয়। হেগেল ইতিহাসের মধ্যে বিশ্বপ্রজ্ঞার উদ্দেশ্য সাধন দেখতে পেয়েছিলেন স্বামীজী কিন্তু এ ধরণের বিমূর্ত মতে বিশ্বাসী নন। ব্রাহ্মণ যুগ, ক্ষত্রিয় যুগ, বৈশ্য যুগ, শূদ্র যুগ—এইগুলিকে তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এবং সেই সাথে একথাও বলেছেন যে ইতিহাসের মূল পরিচালক মানুষ। সাধারণভাবে মানুষ এই চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে ইতিহাস গড়ে তুললেও স্বীয় শক্তিতে সে ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে বিভিন্ন দিকে। আসলে ইতিহাসের নিজস্ব কর্মধারা তাত্ত্বিক, এবং বাস্তব রূপ নির্ভর করে মানুষের ওপর। মানুষের এই স্বকীয় সত্তা থাকার ফলেই ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক গঠন একই ঐতিহাসিক পর্যায়ে সহাবস্থান করতে পারে। সাম্প্রতিক কালে আরব রাষ্ট্রগুলিতে চলেছে ব্রাহ্মণ শাসন (কারণ ঐসব সমাজের মূল পরিচালিকা শক্তি এখনও ধর্মীয় নেতাদের হাতে), লাতিন আমেরিকায় ক্ষত্রিয় শাসন (ওখানকার রাষ্ট্রগুলি যেন সামরিক নেতাদের ভাগ্যপরীক্ষার মঞ্চ), ইউরোপ আমেরিকায় বৈশ্য শাসন, এবং চীন রাশিয়ায় শূদ্র শাসন ইতিহাসের যদি বিমূর্ত সত্তা থাকত, নিজস্ব গতি থাকত, তবে প্রতিটি জাতিকে এই চারটি যুগ বা শাসন একে একে অতিক্রম করতে হত। কিন্তু যেহেতু ইতিহাসের মূল পরিচালক মানুষ, কেবল মানুষ-ই, সেজন্য ইতিহাস সব সময় এই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে না। ইরান ক্ষত্রিয় শাসন থেকে ব্রাহ্মণ শাসনে ফিরে গেল, তিব্বতে চেষ্টা চলছে ব্রাহ্মণ শাসন থেকে সরাসরি শূদ্র শাসনে আসার জন্য। মূল কথাটা হল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ওই চারটি যুগের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতিহাস আবর্তিত হয়ে চলেছে। বিশ্বের কোথায় কোনটি দেখা দেবে তা নির্ভর করছে মানুষের ওপর, কারণ মানুষের নিজস্ব একটি সত্তা আছে যা ইতিহাস-নিরপেক্ষ অতএব ভবিষ্যতে ইতিহাসের গতি ঠিক কি হবে তাও নির্ভর করছে মানুষের ওপর। সামাজিক মৌল চারটি শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানুষ কিভাবে ও কতখানি সাড়া দেবে সেইটি স্থির করে দেবে ইতিহাসের পদক্ষেপ কি হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, স্বামীজী যে বলেছেন ভবিষ্যতে সব দেশেই শূদ্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, সুতরাং ইতিহাসের নিজস্ব গতি নেই কি করে বলা যায়?

স্বামীজী আদর্শ শূদ্র জাগরণ বলতে জনসাধারণের জাগরণ বুঝিয়েছেন, জনসাধারণের নামে কোনও গোষ্ঠির জাগরণ নয়। এবং তিনি জনসাধারণের শাসন বলতে বুঝিয়েছেন দেশের শাসনে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা এবং স্বাধীনতার উন্মুক্ত পরিবেশ। সাধারণভাবে শূদ্র শাসন বলতে যা বোঝায় তার ভাল-মন্দ দিক সম্বন্ধে স্বামীজী যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, তা পরবর্তী ইতিহাসে মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। এটিকে স্বামীজী কখনোই জনসাধারণের প্রকৃত শাসন বলে ধরেন নি। দ্বিতীয়তঃ, একই শাসন বিভিন্ন কালে ও দেশে বিভিন্ন রূপ ধরে। মৌল চরিত্রে অভিন্ন হলেও প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ শাসন, মধ্যযুগীয় ইউরোপের ব্রাহ্মণ শাসন (পোপতন্ত্র) এবং আধুনিক আরবী রাষ্ট্রগুলির ব্রাহ্মণ-শাসনের (মোল্লাতন্ত্র) বাহ্যিক রূপ এক নয়। আবার প্রাচীন গ্রীস-রোমের ক্ষত্রিয় শাসন দাস-প্রথার ওপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু ভারতীয় ক্ষত্রিয়-শাসনে দাস-প্রথার এমন ব্যাপকতা দেখা যায়নি। ইতিহাসের চরিত্রে এই যে বিভিন্নতা, এটির কারণ মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি। এভাবে স্বামীজী মানুষের ওপর অধিকতর আস্থা রেখে ইতিহাসের মৌল চরিত্র ব্যাখ্যা করে, তাকে অদৃষ্টবাদ বা অন্ধ নিয়তির হাত থেকে মুক্ত করেছেন।

এবারে যে বিষয়টি বিচার্য তা হল, ইতিহাসে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তা কি সব সময় অগ্রগতির পরিচারক? এর উত্তর, না। অনেক সময়েই দেখা গেছে, সামাজিক পরিবর্তন ইতিহাসের গতিকে তথা সেই সমাজকে পিছিয়ে দিয়েছে যেমন বাংলাদেশে গণতন্ত্র থেকে সামরিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, কিংবা চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব। তাহলে কি উন্নতি-অবনতি নিরপেক্ষ একমাত্র পরিবর্তনই সত্য, যে-কথা কিছু কিছু ঐতিহাসিক বলেছেন? তাও নয়। সমাজের বাহ্যিক কাঠামোগত শক্তিগুলির বিকাশের নিজস্ব মানদণ্ড রয়েছে, যদিও এই শক্তিগুলির কয়েকটির মানদণ্ড সমগ্র বিশ্বে একই রকম (যেমন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপতি ইত্যাদি), আর কয়েকটির মানদণ্ড দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন (যেমন শিল্পকলা সাহিত্য, নৈতিকতা ইত্যাদি)। এইগুলির উন্নতি-অবনতির একটা মানদণ্ড পাওয়া যায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সামাজিক প্রক্রিয়ার বা পরিবর্তনের মানদণ্ড কি যার সাহায্যে ইতিহাসের প্রগতিশীল পরিবর্তনগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল পরিবর্তন থেকে আলাদা করা যায়?

স্বামীজী বলেছেন—জড়ের বিরুদ্ধে চেতনার সংগ্রাম ও ক্রমাধিপত্যই ক্রম-বিকাশের ইতিহাস। তাঁর ভাষায়ঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে সেই চেতন, তাতেই চৈতন্যের বিকাশ হয়েছে।[২৪] এই প্রকৃতি দুই রকম—বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতি। বহিঃপ্রকৃতি বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক শক্তিগুলি, যাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে জয় করার চেষ্টা হয়, আর অন্তরপ্রকৃতি হল মানুষের মন যাকে জয় করা যায় নৈতিকতা ও ধর্ম দিয়ে। কোন সামাজিক পরিবর্তনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, এই পরিবর্তনের ফলে মানুষ বহিঃ বা অন্তর প্রকৃতি বা দুটিকেই জয় করার পথে এগিয়েছে কিনা। মানুষ যদি উপকৃত হয় তবে পরিবর্তনটি প্রগতিশীল, আর অপকৃত হলে প্রগতি বিরোধী। সেইসাথে মনে রাখতে হবে—এই পরিবর্তনের ফলে সামাজিক মৌল শক্তিগুলি কতখানি বিকেন্দ্রায়িত হল।

প্রশ্ন হতে পারে—অন্তরপ্রকৃতির কথা বিচার করার কি দরকার, বহিঃ-প্রকৃতির জয়ই কি যথেষ্ট নয়? না। অন্তর প্রকৃতিকে জয় না করে শুধু বহিঃ প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করলে আমরা ফ্রাংকেনস্টাইনের দৈত্যকেই পাব। এই কথাটি স্বামীজী বার বার বলে গেছেন। তাঁর কথার প্রতিধ্বনি আজ শোনা যাচ্ছে পাশ্চাত্য জগতেও। 'দ্য মীনিং অব হিস্ট্রি' বইয়ে এরিখ কাহলার এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মানুষ বহিঃপ্রকৃতির ওপর তার নিয়ন্ত্রণ বহুগুণ বাড়ালেও হারিয়েছে তার মনের ও চরিত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ, ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা যান্ত্রিক বর্বরতায় পর্যবসিত হচ্ছে। আলভিন টফলার একই কথা বলেছেন টয়েনবী, সলঝেনিৎসিন, শাখারভ, হাকসলী। সমাজের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাহায্যে যে শক্তিগুলি মানুষ লাভ করেছে, সেই শক্তিই তাকে ঠেলে দিচ্ছে অবক্ষয়ের দিকে। বৈশ্য শাসনের বদলে মার্কসবাদী শূদ্র শাসন এনেও এই বিপদকে ঠেকানো যাবে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ হলেই মানুষের মন থেকে লোভ হিংসা দূর হয় না। মনস্তত্ত্বানুসারে ক্ষমতালিপ্সা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা অর্থনৈতিক চাহিদা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় না। রাশিয়ার স্তালিন ক্রুশ্চেভ, চীনে লিউশাওচি লিনপিয়াও চিয়াংচিং, কম্বোডিয়ায় পলপট প্রমুখের পরিণতি এই সত্যকেই প্রমাণিত করেছে। তাছাড়া, ভবিষ্যতের কমিউন বা সমিতির পরিচালকেরা ক্ষমতালিপ্সায় আক্রান্ত হবেন না, এ ধরণের আশা যুক্তিহীন।

[উনপঞ্চাশ]

প্রথম শর্ত—মূল্যবোধের পরিবর্তন

বিপ্লব প্রসঙ্গে স্বামীজী যে 'আমূল সংস্কার-এর কথা বলেছেন তার প্রাথমিক শর্তই হল মূল্যবোধের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন তো চুল দাড়ির মতো স্বাভাবিক হতে পারে না, একে চেতনার স্তরে নিয়ে আসতে হলে চাই মৌলিক চিন্তা, আদর্শনিষ্ঠা, ও আন্তরিক প্রয়াস। এবং এগুলির পেছনে থাকা দরকার স্বার্থত্যাগের প্রেরণা। সমাজের সর্বস্তরে যদি এই নতুন মূল্য-বোধের উদ্বোধন ঘটানো না যায়, তবে সমাজ বিপ্লব কথাটা তাৎপর্যহীন হযে যায়। বিপ্লবের একটা প্রস্তুতি চাই, ক্রমবিবর্তনের সূত্রকে অস্বীকার করে বিরাট লাফ দেওয়াটা অবৈজ্ঞানিক পন্থা। এই প্রস্তুতি চালাতে হবে একেবারে গোড়া থেকে। বৈপ্লবিক চেতনা প্রথমে জাগে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের মনে। তাদের চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপ অনুরণন তোলে আরও পাঁচজন মানুষের মনে। এইভাবে অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় মানুষের মন হযে ওঠে বিপ্লবী, সেই সাথে প্রকৃত বিপ্লবীর চারিত্রিক গুণগুলি, যেমন স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি, আদর্শনিষ্ঠা ইত্যাদি চেতনাকে রঞ্জিত করে তোলে। স্বামী বিবেকানন্দ একেই বলেছেন মানুষ গড়া। এই মানুষ গড়ার কাজে সফল না হলে বিপ্লবের প্রধান শর্তই থাকে উপেক্ষিত। প্রতিটি ইট যদি শক্ত না হয, তবে তা দিয়ে বাড়ি তৈরী করলে তা নড়বড়ে হবেই।

শোষণ সম্পর্কে স্বামীজীর মত আমরা আগেই আলোচনা করেছি।[১] দেখেছি যে জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ, ও কায়িক শ্রম, সমাজের এই চারিটি মৌলিক শক্তি যদি সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত না হয়ে কোনো বিশেষ গোষ্ঠির করায়ত্ত হয়, তখনই সমাজে শোষণ দেখা দেয়। এইগুলি যেহেতু সমাজের মৌল কাঠামো, তাই এগুলির কোনো একটি বা একাধিক শক্তির কোনও বিশেষ গোষ্ঠির করায়ত্ত হওযার নামই 'বিশেষ সুবিধাবাদ'। বিপ্লবের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, এই বিশেষ সুবিধাবাদকে বাতিল করে সমাজের সর্বস্তরে এই মৌলিক শক্তি-গুলিকে সঞ্চারিত করা। তা করতে পারলেই সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের

পরিবেশ তৈরী হবে। সমাজের যে কোন পরিবর্তনকেই বিপ্লব বলা যায় না। একটি পরিবর্তন বিপ্লব কিনা তা বিচার করতে গেলে দেখতে হবে ঐ পরিবর্তনের ফলে মৌল শক্তিগুলির বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে কিনা। একটি বা তুটি শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ হলে তা আংশিক বিপ্লব। আর সব কটির হলে পূর্ণ বিপ্লব।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র

রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে এক-নায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের যে বিতর্ক চলে আসছে বহুকাল ধরে, আজও তার সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। যেসব বিভিন্ন ধরণের শাসন প্রণালী দেখা গেছে তা আসলে এই তুটি তন্ত্রেরই বিভিন্ন রূপ। একটি মতের ত্রুটি ধরা পড়ায় অন্য মত উদ্ভাসিত হয়েছে। নতুন মতটিতে মানুষ কিছুকাল লাভবান হয়েছে, পরে দেখা গেছে নতুন ত্রুটি; তার সমাধানে মানুষ খুঁজছে আরেকটি মত।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সব তন্ত্রই উদ্ভাবিত হয়েছে ব্যক্তিমানুষের উদ্বোধনের বা এর বিকাশের দোহাই দিয়ে। আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রকেই চরম বলে ধরেছে সকলে, এবং সামগ্রিক জনকল্যাণের দোহাই দিয়ে একনায়কতন্ত্রেরও উদ্ভব ঘটেছে।

মুক্তমতি মানুষদের কাছে কমিউনিজম কোন বিকল্প পথ নয়। জনগণ তথা সমগ্র দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতির ওপর একটি পার্টি বা গোষ্ঠির প্রভুত্ব চাপাবার ঐ এক নয়া রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। এ ধরণের একনায়কতন্ত্রই শুধু নয়, যে-কোনও ধরণের একনায়কতন্ত্রই দেশের কিছুটা কল্যাণ করতে সমর্থ হয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মানীকে ২০ বছরেরও কম সময়ে হিটলার এক অখণ্ড শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিলেন। পাকিস্তানে আয়ুবশাহী জমানার প্রথম দিকেও সে-রাষ্ট্রের নানান অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আর ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগ তো এখনও স্বর্ণযুগ, যদিও রাজতন্ত্র একনায়কতন্ত্রেরই রকমফের। তাই একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে-কোনও অজুহাতই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের মুখোমুখি হতেই হয়। পশ্চিম ইউরোপে ও দক্ষিণ আমেরিকায় এটি দেখা গেছে, পূর্ব ইউরোপ ও চীনে এটি অনুভূত হচ্ছে এবং রাশিয়ার পার্টির সেক্রেটারী পরিবর্তনের সাথে

সাথে নতুন পথ উদ্ভাবন করে এর সামাল দেবার চেষ্টা হচ্ছে (স্তালিন এবং পরবর্তী পার্টি-নায়কদের ভাষণগুলি লক্ষনীয়)।

তথাকথিত গণতন্ত্র কিন্তু আমাদের পৌঁছে দিতে পারছে না স্বর্গরাজ্য। দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতিতে আমরা যেমন কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠির সর্বাত্মক হস্তক্ষেপ চাইনা, তেমনি চাইনা ব্যবসায়ীদের হস্তক্ষেপও। আমরা চাই মুক্ত দুনিয়ার মানুষ হতে—তৃতীয় বিশ্বের এটাই অভিমত। কিন্তু মুক্তমানুষ হতে আমরা পারছি না। কারণ ? প্রথমত, আমরা নিজেরাই চাইনা মুক্ত মানুষ হতে। পাঁচ বছর বাদে বাদে ভোট দিয়ে আমরা কোনও একটি রাজনৈতিক দলের কাছে দেশটাকে যেন 'লীজ' রেখে দিই। আমাদের ভাগ্য সঁপে দিই তার হাতে, সবকিছুর জন্যই তাকিয়ে থাকি শাসক দলের মুখের দিকে। পাড়ায় নর্দমায় ময়লা জমে দুর্গন্ধ হয়েছে ? সরকারই তা পরিষ্কার করুক। বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে ? সরকারই তা বন্ধ করুক। অঞ্চলের অমুক গুণ্ডা ত্রাসের সঞ্চার করছে ? সরকারই তাকে গ্রেপ্তার করুক। এই হলো আমাদের মনোভাব। আমরা যেন 'নাবালক', আব সরকার যেন আমাদের 'অছি' (ট্রাস্টী)। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলিও চায় না জনসাধারণ আত্মনির্ভরশীল হোক। দলগুলির উদ্দেশ্য—মানুষেরা আত্মনির্ভরশীল না হয়ে যেন পার্টিনির্ভরশীল হযে ওঠে। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কারখানায়, চাষের জমিতে, অফিসে সর্বত্রই এই দলগুলির শাখা সংগঠন থাকে। ছাত্র কল্যাণ, কৃষক-কল্যাণ, শ্রমিক-কল্যাণ ইত্যাদি এর মূল উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য—'কমিটেড ভোটার' তৈরী করা।

এই পরিস্থিতিতে দলীয় নেতারা জনসাধারণকে সব রকম দায়-দায়িত্ব থেকে নিস্কৃতি দিয়ে করে তুলেছেন পরমুখাপেক্ষী। আমাদের যে একটা সৃজনী ক্ষমতা আছে, রাজনীতিকে বাদ দিয়ে আমারও যে যথার্থ সমাজ কল্যাণে হাত লাগাতে পারি, এটি আমরা ভুলতে বসেছি। অথচ গ্রামে-শহরে নানান অ-রাজনৈতিক সংস্থা হাসপাতাল, হাতে-কলমে বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করে যাচ্ছে। বহু শিক্ষালয়, সমবায় সংস্থা, হাসপাতাস, হাতে কলমে বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান· অনাথ আশ্রম ইত্যাদি এ ধরণের সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অনেক স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অবসর সময়ে গ্রামে গিয়ে রাস্তাঘাট তৈরী করে দিচ্ছে, পুকুর পরিস্কার

করছে। অতএব, দেশ গোল্লায় যাচ্ছে এ-কথা ঠিক নয়। জনসাধারণ বিচ্ছিন্নভাবে তাদের সৃজনীশক্তির পরিচয় দিচ্ছে, আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাচ্ছে। যা দরকার, তা হলো এর পরিধি বাড়ানো।

মনে রাখতে হবে, মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে তার ব্যক্তিত্ব বিনাশের জন্য নয়, বরং ব্যক্তিত্ব-বিকাশের একটি হাতিয়ার হিসেবেই সমাজের সৃষ্টি। স্বামীজীর মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক বিপ্লব, শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিপ্লব নয়। গণচেতনার প্রসার, সংগ্রাম, এবং পুনর্গঠন—এই তিনটি বিষয় হাত ধরাধরি করে চলবে। বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি ? তিনি লিখেছেন, "The new order of things is the salvation of the people by the people"[২] —নতুন বিষয়টি হলো, জনগণের দ্বারা জনগণের মুক্তি সাধন। "আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ।"[৩]

"সব বিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়াই পুরুষার্থ। যাতে সবাই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে এগোতে পারে সে-বিষয়ে সাহায্য করা এবং নিজেও সেইদিকে এগিয়ে যাওয়া দরকার। যে-সব সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতা-বিকাশের ব্যাঘাত করে সেগুলি অকল্যাণকর। এই অকল্যাণকর বিষয়গুলি যাতে তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয় সেভাবে কাজ করা উচিত।"[৪]

উল্লিখিত উক্তি থেকেই বোঝা যায়, স্বামীজী মিল-স্পেন্সার-বেন্থাম প্রমুখের মতো উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী নন, আবার বিপরীত দিকে সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সমর্থকও নন। তাঁকে গণতন্ত্রের সমর্থক মনে হয় যখন তিনি বলেন,[৫] "চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভরতা, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা।" "ব্যক্তিত্ব বিকাশের শর্তই হলো স্বাধীনতা" (Freedom is the condition of growth)। কিন্তু গণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করার সাথে সাথে এর দুটি ত্রুটিরও উল্লেখ করেছেন তিনি—একটি আসে প্রজাদের দিক থেকে, অন্যটি শাসকদের দিক থেকে। গণতন্ত্রের অত্যধিক প্রয়োগে প্রজাদের উচ্ছৃঙ্খল হবার সম্ভাবনা ব্যক্তি স্বাধীনতা পর্যবসিত হয় স্বার্থপর স্বাধীনতায়—"বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গি, অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে।"[৬] আর শাসকেরা ?

স্বামীজী লিখছেন, "ও তোমার পার্লেমেণ্ট দেখলুম, সেনেট দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! · শক্তিমান পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।···রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে···সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে।"[৭] "পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় 'শাইলকের' শাসনে পরিচালিত হচ্ছে। আপনারা যে প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লামেণ্ট, মহাসভা প্রভৃতির কথা শোনেন সেগুলি বাজে কথামাত্র। পাশ্চাত্য দেশ শাইলকদের অত্যাচারের আর্তনাদ করছে।"[৮]

সমাজতন্ত্রের ভাল দিকটি কি? স্বামীজীর মতে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের কাছে নতি স্বীকার করানোর কঠোর শিক্ষার মস্ত বড় গুণ হলো—সমাজ নির্দেশিত কাজে ব্যক্তির কর্মনিপুণতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ নিজের স্রোতে চলে।[৯] আর এর দোষ কি? সমাজের কাছে ব্যক্তির দাসত্বের পরিণামে উৎসাহ, মননশীলতা, তীব্র অনুভূতির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়; এইসব হতভাগ্য লোকেরা বুঝতে পারেনা স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় দ্যুতি কি বস্তু। স্বামীজীর ভাষায়—"[সমাজ-নির্দেশিত কর্ম] মানুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া করে···নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই।·· এ অবস্থার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু আছে কি না মনেও আসেনা, আসিলেও বিশ্বাস হয়না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয়না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।"[১০]

স্বামীজী দেখিয়েছেন, বৈচিত্র্যকরণের ওপর গণতন্ত্রী যে গুরুত্ব দেন, তা যেমন সঙ্গত তেমনি সমাজতন্ত্রীর যৌথস্বার্থের গুরুত্বও সঙ্গত। আর এ-কারণেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার সাথে 'বহুজনহিতায়' 'বহুজনসুখায়'-এর আদর্শ যুক্ত করতে চেয়েছেন। এই আদর্শেরই সন্ধান তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর নতুন সমাজ ব্যবস্থার কল্পনায়।

শ্রেণীহীন সমাজের তাৎপর্য

'শ্রেণীহীন সমাজ' সম্বন্ধে কার্ল মার্কস্ ও স্বামীজীর চিন্তাধারার তফাৎ আছে। 'দ্য জার্মান ইডিওলজী' গ্রন্থে মার্কস্-এঙ্গেলস লিখেছেন, "···in communist

society, where nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general producton and thus makes it possible for me to do one thing today another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticise after dinner, just as I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, shepherd or critic." মার্কস্‌ এখানে যে বললেন "society···makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow"—এটা কি অতিকথন-দোষে দুষ্ট নয় ? স্কুলের শিক্ষক যদি আজ কারখানার পরিচালক, কাল বাড়ি তৈরীর রাজমিস্ত্রী, পরশু ডাক্তার হতে চান, কিংবা কোন সঙ্গীতজ্ঞ যদি আজ অফিসের কেরাণী, কাল বাসের ড্রাইভার, পরশু মহাকাশ অভিযানে যেতে চান—তবে সমাজব্যবস্থা টিঁকতে পারে না। যে শ্রমবিভাগ বাধ্যতামূলক নিপীড়ন হয়ে দাঁড়ায় সেটি মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর, এই বাধ্যতামূলক নিপীড়ন বন্ধ করতে হবেই। কিন্তু এটি করতে গিয়ে শ্রমবিভাগকে বাতিল করে দেওয়া যায় না। শ্রমবিভাগ সমাজে থাকবেই, নাহলে সমাজ টিঁকতে পারে না, কিন্তু দেখতে হবে এটি যেন বাধ্যতামূলক নিপীড়ন হয়ে না দাঁড়ায়। স্বামীজী বলেছেন, "এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোকের চেয়ে স্বভাবতই বেশি বুদ্ধিমান—এটি আমাদের সমস্যা নয়। আমাদের সমস্যা হল, বুদ্ধির আধিক্যের সুযোগ নিয়ে এই শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে তাদের দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও কেড়ে নেবে কিনা। · এ-রকম অধিকার বোধ থাকা নীতিসম্মত নয় এবং এর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম।"[১১] If there is inequality in nature, still there must be equal chance for all—if greater for some and for some less—the weaker should be given more chance than the stronger."[১২] কর্মঅনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ হওয়া সমাজের স্বভাব। সে ভাগ থাকবে, কিন্তু চলে যাবে বিশেষ-বিশেষ অধিকারগুলি। সামাজিক জীবনে আমি বিশেষ এক ধরণের কাজ করতে পারি, তুমি অন্য ধরনের কাজ করতে পারো। তুমি না হয় দেশ শাসন করো, আমি না হয় জুতো সারাই। কিন্তু তাই বলে তুমি

আমার চেয়ে বড় হতে পারো না। তুমি খুন করলে প্রশংসা পাবে, আর একটা আম চুরি করলে আমাকে ফাঁসি যেতে হবে—এমন হতে পারে না। এই অধিকার তারতম্যকে প্রচণ্ড আঘাত করে উঠিয়ে দিতে হবেই।...আমরা চাই—কারো কোনো বিশেষ অধিকার (special privilege) থাকবে না, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির সামনে সুযোগ থাকবে।" [১৩]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্বামীজী শ্রেণীহীন সমাজ বলতে বুঝিয়েছেন—ভোগের বিশেষাধিকার যুক্ত শ্রেণীবিহীন সমাজ। তিনি দেখিয়েছেন এই 'বিশেষ অধিকার' কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকেই আসে না, আসে মর্যাদাগত দিক থেকে (যেমন অতীতে পণ্ডিত দরিদ্র ব্রাহ্মণও ধনী জমিদারের মতো সম্মান পেত), সামাজিক ধ্যান ধারণাগত দিক থেকে (যেমন পুরুষেরা মেয়েদের থেকে শ্রেষ্ঠ), জাতিগত দিক থেকে (যেমন আমেরিকানরা নিজেদের নিগ্রোদের থেকে উঁচু বলে মনে করে) ইত্যাদি। স্বামীজী বলেছেন, এই ভেদগুলিকে ভিত্তি করে শ্রেষ্ঠদের বিশেষ সুবিধে দেওয়া চলবে না, বরং দুর্বলশ্রেণীকে আরও সাহায্য করা হোক। তিনি বলেছেন কর্মকুশলতাই প্রধান —"প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকে এমন একজন অধ্যাপকের চেয়ে একজন মুচি যে সবচেয়ে কম সময়ে একজোড়া সুন্দর জুতো তৈরী করতে পারে সে অনেক বড়।"[১৪]

স্বামীজী আরও বলেছেন "সকলের তুল্য ভোগাধিকার থাকা উচিত। বংশগত বা গুণগত জাতিভেদজনিত ভোগ বা অধিকারের তারতম্য উঠে যাওয়া উচিত।"[১৫] এই বংশগত বা জাতিগত ভেদ থাকলে কি হবে? স্বামীজীর মতে, এতে মানুষের মনে একটি মিথ্যা অহমিকার সৃষ্টি হয় এবং তার নিজের সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁর ভাষায়—বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল; তাহাতে বিরাঙ্গনা দাসী, ধীবর বা সারথিকুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য।"[১৬]

সামাজিক বিপ্লব

মার্কসের মতে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হলেই সমাজের রূপান্তর সম্ভব।

স্বামীজীর ধারণা এর বিপরীত ; তাঁর মতে সমাজ-বিপ্লব না হলে রাজনৈতিক বিপ্লব অন্য সমস্যা টেনে নিয়ে আসবে। বাস্তব ইতিহাসেও আমরা দেখি, রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে হিটলার-খোমেইনি-পলপটের আবির্ভাব সম্ভব। তাই স্বামীজী যখন বলেন[১৭] "আমি আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী" কিংবা "মূলে অগ্নিসংযোগ করো" তখন তিনি গণচেতনার উদ্বোধনকে প্রধান কর্তব্য বলে নির্দেশ করেন। ২০-৬-১৮৯৪ তারিখের একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পথ। আমাদের সমাজ-সংস্কারকেরা খুঁজে পান না ক্ষতটি কোথায়। বিধবা-বিবাহের সাহায্যে তারা জাতিকে উদ্ধার করতে চান। ·· সমস্ত ত্রুটির মূলই এখানে যে সত্যিকার জাতি, যারা কুটিরে বাস করে, তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলে গেছে।···তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের শিক্ষিত করতে হবে।·· প্রত্যেককেই তার নিজের মুক্তির পথ করে নিতে হবে। আসুন, আমরা তাদের মাথায় ভাব ঢুকিয়ে দিই—বাকীটুকু তারা নিজেরাই করে নেবে।·· সেই সাথে সংস্কারকদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের সংস্কৃতি ধারা, নিজের জীবনে মেলাতে হবে।" প্রায় একই কথা লিখেছেন ২৩-৬-৯৪ তারিখের চিঠিতে—"আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাদের শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগিয়ে তোলা।·· তাদের চোখ খুলে দিতে হবে যাতে তারা জানতে পারে—জগতে কোথায় কি হচ্ছে।" দরিদ্রশ্রেণীর কথা বলার সাথে সাথে নারী- সমস্যার ওপরও তিনি জোর দিয়েছিলেন। এই নারী সমস্যার সমাধানেও তিনি মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন—পজিটিভ কিছু শেখা চাই। খালি বইপড়া শিক্ষা হলে চলবে না। যাতে character form হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই।···ঐ রকম শিক্ষা পেলে মেয়েদের problems মেয়েরা নিজেরাই Solve করবে।·· নারীদের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করবার অধিকার শুধু তাদের শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত। নারীদের এমন যোগ্যতা অর্জন করাতে হবে যাতে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরা মীমাংসা করতে পারে।"[১৮] এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর শিষ্যা সিস্টার ক্রিস্টিন লিখেছেন—"স্বামীজীর কাছে নারীমুক্তির অর্থ সীমার বন্ধন মুক্তি, যা নারীর প্রকৃত

শক্তিকে প্রকাশিত করবে।”[১৯]

অত্যধিক রাজনীতিকরণ সমাজকে একমুখী করে তোলে এবং সামাজিক শক্তির উদ্ভবের ক্ষেত্র সীমিত করে আনে—স্বামীজীর কাছে এ-বিষয়টি ধরা পড়েছিল। রাজনীতির মূল লক্ষ্য থাকে রাষ্ট্র-পরিচালনার ওপর এবং কোনো বিশেষ তত্ত্বের ওপর এটি জোর দেয়। বিপরীত দিকে সমাজনীতি হল মানুষের সব রকম কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা এবং স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তনে সমাজনীতি ভিন্ন রূপ ধারণ করে। ফলে সমাজনীতি কখনোই অনড় কোনো মতবাদে পর্যবসিত হয় না। রাজনৈতিক শক্তি ও সামাজিক শক্তির মধ্যেও একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে কোন-না কোন-রকম গোষ্ঠীতন্ত্র গডে ওঠে, বিপরীতদিকে সামাজিক শক্তিব ভিত্তি হল আপামর জনসাধারণ। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সামাজিক অনাচারের জন্য কোনো কোনো মনীষী দায়ী করেছেন উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের হোতাদের। এই ধারণা কিন্তু ভুল। এই অনাচারের মূল কারণ, ভারতের সব ক্ষেত্রে রাজনীতিকরণের অত্যধিক প্রয়াস। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হতে কয়েকজন ভারতীয় মনীষী ইউরোপের অনুকরণে রাজনীতির ওপর যে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসেবে উৎপত্তি ঘটল গোষ্ঠীতন্ত্রের। হরিপুরা কংগ্রেসে গান্ধীজীর কার্যকলাপ থেকে জিন্নার পাকিস্তান-দাবীর মধ্যে ঘটলো এরই নগ্ন প্রকাশ। একই ধারা বেয়ে স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দ গভীরতর সংকটে পডেছেন, যার ফলে আজ ভারতের দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী সকল নেতাই শ্রেণীচরিত্রে অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এই অত্যধিক রাজনীতিকরণের ফলেই ভারতের সামাজিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না।

স্বামীজী তাই সামাজিক বিপ্লবের ওপর জোর দিয়েছিলেন; তিনি বলে-ছিলেন, সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটলে সমাজের অন্যান্য শক্তির বিকাশ ঘটবে এবং যে-কোনো অন্যায়ের প্রতিকারে সমাজ এগিয়ে যাবে। সামাজিক বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য, শিক্ষা ও গণচেতনার প্রসার। এরপর ক্রমান্বয়ে অন্য সামাজিক সৌধগুলিতে বিপ্লব আনার প্রক্রিয়াও চলবে। বিপ্লব বলতে স্বামীজী ‘মূল্যবোধের পরিবর্তনে’র ওপর জোর দিয়েছেন। সাবেকী ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে সাহসী হওয়াকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। সেই

সাথে বলেছেন, দৈহিক মানসিক আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নতির কথা। দৈহিক স্তরে উন্নতির জন্য চাই খাওয়া পরা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি। মানসিক স্তরে উন্নতির জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি। এবং সেই সাথে আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথা তুলে ধরেছেন মানুষের জীবনকে অখণ্ড রূপ দেবার জন্য। গ্রীক মনের সাথে ভারতীয় মন মেলালে তা আদর্শ মানুষ তৈরী করবে, পাশ্চাত্যের কর্মকুশলতার সাথে চাই প্রাচ্য প্রজ্ঞা—এ-ধরণের কথা বারবার বলেছেন স্বামীজী।[২০] প্রাচ্য প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ দর্শন তার আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা বলতে তিনি বুঝতেন "সন্ধানের, সংগ্রামের, দর্শনের, আকাঙ্ক্ষার, এবং বশ-না-মানার শক্তিকে" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭)।

স্বামীজী কথিত সামাজিক বিপ্লবের অনেকগুলি দিক আছে।
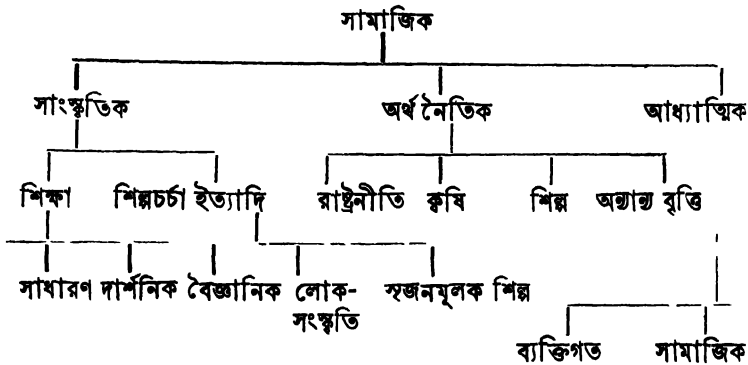
সামাজিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে—মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও সাবলম্বী করে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রাণিত করা। বাস্তব ক্রিয়াকলাপে এর তিনটি দিক: সাংস্কৃতিক (মানসিক উন্নতির জন্য), অর্থনৈতিক (দৈহিক স্তরে উন্নতির জন্য) এবং আধ্যাত্মিক। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান দিক দু'টি—শিক্ষা ও শিল্পচর্চা। সাধারণ শিক্ষায় মানুষের চোখ খুলে যায়, সে জানতে পারে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে; দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তাকে স্বাধীন চিন্তায় প্রবৃত্ত করে। শিল্পের মধ্যে স্বামীজী নাচ-গান-নাটক-সাহিত্য-সহ সংস্কৃতির সকল দিকই ধরেছেন। তিনি একদিকে জোর দিয়েছেন লোক-সংস্কৃতির ওপর, অন্যদিকে সৃজনমূলক সাংস্কৃতিক

ক্রিয়াকলাপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি—"এখন চাই আর্ট আর ইউটিলিটির সংযোগ, যেটা জাপান চট করে ধরতে পেরেছে ·।"...[২১] তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পী ও কলকাতা জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সাথে স্বামীজী শিল্পকলা নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন সেখানে তিনি রণদাবাবুকে বলেছিলেন "original কিছু করতে চেষ্টা করবেন" যাতে idea-র expression নেই, রং বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art বলা যায় না।" [২২] স্বামীজীর শিল্প-ভাবনা সম্বন্ধে আচার্য নন্দলাল বসু বলেছিলেন "বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতির মত চলতি বলার ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ায় যেমন তৎকালীন সাহিত্য সাধারণের সহজবোধ্য ও জোরালো হয়েছিল, স্বামীজীও ঐ পথে বাংলা ভাষাকে চালিত করেছিলেন। শিল্পে বহুদিনের জটিল mannerism-কে [স্বামীজী] কঠোর ভাষায় আঘাত করেছেন। আগতকালের শিল্প তাঁর বাণী অনুসরণ করে আবার সহজ, প্রাণবান ও দৃঢ় হবে। শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর ideal শিল্পের backbone-এর মত ··।" (শিল্প জিজ্ঞাসায় শিল্প দীপঙ্কর নন্দলাল—বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, পৃঃ ২৭-২৮)

অর্থনৈতিক দিকের বিভিন্ন শাখা (রাষ্ট্রনীতি, কৃষি শিল্প ইত্যাদি) সম্বন্ধে আমরা 'বিপ্লবের পথ' অধ্যায়ে আলোচনা করব। স্বামীজীর চিন্তায় নতুন রাষ্ট্রনীতির দিশা রয়েছে। রাষ্ট্রদায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনসাধারণ যে কেবল রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারেই দক্ষ হবে তা নয়, সমবায় শক্তিরও যথার্থ উদ্বোধন ঘটবে। প্রাথমিক সামান্য কয়েকটি দায়িত্ব পালন করা ছাড়া রাষ্ট্রের কোন কর্তব্য থাকবে না। প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব গ্রামসভা থাকবে, যেখানে গ্রামের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ মাসে অন্তত দুবার মিলিত হয়ে তাদের সমস্যাবলী আলোচনা করবে এবং সমাধান খুঁজে বের করবে। তারা একজনকে নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করেপাঠাবে গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে হবে একটি পঞ্চায়েত। প্রতিটি পঞ্চায়েত থেকে একজন করে নির্বাচিত সদস্য যাবে বিধানসভায়। অনুরূপ-ভাবে শহরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে থাকবে নগর সভা এবং কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে নগর পঞ্চায়েত। বিধানসভার প্রতিটি সদস্যকেই কোন-না-কোন দায়িত্ব

অর্পণ করা হবে, কিন্তু গ্রাম কিংবা অঞ্চলের ওপর বিধানসভা কোনো পরিকল্পনা বা মত চাপিয়ে দিতে পারবে না। নিজস্ব গ্রাম ও অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা করবে জনসাধারণ। সেই পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিধানসভা পরিকল্পনা করবে। যানবাহন, যোগাযোগ, উচ্চশিক্ষা, বিদ্যুৎ, ভারী শিল্প ইত্যাদি যেসব বিষয় রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির সাথে জড়িত সে-বিষয়েই বিধানসভা সিদ্ধান্ত নেবে। আসলে কেন্দ্রীয় সভা ও রাজ্যসভাগুলির মূল দায়িত্ব হবে কো-অর্ডিনেটরের।

মনে রাখতে হবে জ্ঞান (শিক্ষা ও সংস্কৃতি) শৌর্য (আরক্ষা ব্যবস্থা) অর্থ এবং কায়িক শ্রম, এই চারটি মৌলিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত না করে সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চার করে দিতে হবে।

স্বামীজীর ধারণায় বিপ্লব হলো সমাজকে সুন্দর করে তোলার এক ধারাবাহিক সচেতন প্রয়াস। যুগে যুগে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে এবং মানুষকে চেষ্টা করতে হবে এগুলির সমাধান করতে। আজ যা মানুষের কাছে আদর্শ, কাল তার বদলে অন্য রূপের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মানব মনের নিরন্তর বিকাশের ফলে মানুষের জাগতিক ও আত্মিক চাহিদা তো নিত্যই পরিবর্তনশীল। মানুষ চিরকালই চাইবে—সুন্দর, আরও সুন্দর সমাজ তৈরী করতে। তাই কোনো বিশেষ গণ্ডির মধ্যে মানুষকে ধরে রাখার চেষ্টাকে স্বামীজী তীব্র সমালোচনা করেছেন। মানুষের স্বভাব চলা, এগিয়ে যাওয়া, আর এই চলার মধ্য দিয়েই সে নিজেকে নতুন নতুনভাবে আবিষ্কার করে। উপনিষদের এই 'চরৈবেতি' মন্ত্রই স্বামীজীর বিপ্লব চিন্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

রাজনৈতিক দলগুলির মতো কোনো শ্রেণী বিশেষকে নয়, স্বামীজী ডাক দিয়েছেন সমগ্র জনসাধারণকে, যুব-সম্প্রদায় নেবে অগ্রণী ভূমিকা, অধিকারহীন মানুষকে তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে। শ্রেণীবিশেষকে কেন্দ্র করে যে সংগঠন তা সমস্যার সমাধানের বদলে অন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। শ্রমিক সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন ইত্যাদি নিজস্ব দাবী নিয়ে যতটা সোচ্চার, সমাজ নিয়ে ততটা নয়। স্বামীজী তাই জাতি-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে সংগঠন তৈরীর কথা বলেছেন। এই সংগঠনগুলিতে শিক্ষক-শ্রমিক-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি একসাথে বসে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সামগ্রিক সমাধান খুঁজবে, যা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। Trade union-এর বদলে

স্বামীজী তাই চেয়েছেন People's union—গণসংগঠন। শ্রেণী-সংগঠন মানুষকে কেবল অধিকার সম্পর্কেই সচেতন করে, গণ-সংগঠন মানুষকে দেবে নতুন চেতনা, যা অধিকার ও কর্তব্যের যুগ্মচেতনায় সমুজ্জ্বল। দুবারের বেশি কেউ কর্মকর্তার পদে থাকতে পারবেনা—এই নিয়ম চালু করলে শক্তি কেন্দ্রীভূত হবে না। এ-ধরনের গণ-সংগঠনের ওপরই স্বামীজী জোর দিয়েছেন, যে গণ সংগঠনগুলি নতুন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নিয়ম চালু হবার সাথে সাথে পরিণত হবে নগর-সভা ও গ্রামসভায়। এভাবেই মানুষ এগিয়ে যাবে নবদিগন্তের দিকে, যেখানে একই সাথে বিকশিত হবে দুটি মূল ভাব—ব্যক্তিত্বের বিকাশ (growth of individuality) এবং 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়' মানুষের সমবেত প্রয়াস।

[বাবমি]

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিপ্লবের তত্ত্ব ও স্বামীজী

বর্তমান বিশ্বে বিপ্লবের নানান মত ও পথ থাকা সত্ত্বেও স্বামীজী কথিত বিপ্লবের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সংসদীয় গণতন্ত্র ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের পথে চললে উন্নতি যে হবে না তা নয়। আমরা চোখের সামনেই দেখেছি কিভাবে গণতান্ত্রিক পথে চলে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপান ও পশ্চিম জার্মানী চমকপ্রদ উন্নতি করেছে, ইজরায়েল শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও মরুভূমির মধ্যে উন্নত জীবনযাত্রা গড়ে তুলেছে। বিপরীত দিকে সমাজতান্ত্রিক পথে হেঁটে রাশিয়া, চীন বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হয়েছে, আবার যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সকে অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলেছেন দ্য গল তাঁর স্বকীয় পন্থায়।

কিন্তু তব এই পথগুলির মধ্যেই এমন একটি ফাঁক রয়েছে যার সাহায্যে কোন না কোন সময়ে একনায়কতন্ত্রীর আবির্ভাব হতে পারে। হিটলারের মতো একনায়কতন্ত্রীরা সংসদীয় গণতন্ত্রের সাহায্যেই এগিয়ে আসতে পারেন, এটি ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে। বিপরীতদিকে মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলিতে কাল্পনিক সমষ্টিসত্তার অহং-এর প্রতিভূ হয়ে গোষ্ঠি নির্বাচিত নেতারা সর্বহারাদের যে প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন তা প্রায় ক্ষেত্রেই সঠিক নয়, জনগণের নামে চাপিয়ে দেওয়া হয় একটা দলের শাসন। এতে মানুষের খাওয়া পরার দুঃখ ঘুচতে পারে, ব্যাহত হয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা। স্তালিন, ক্রুশ্চভ লিন পিয়াও, লিউ শাওচি, চিয়াংচিং, পল পট, মাও সে তুং প্রমুখ নেতাদের কার্যাবলী এ-কথাই প্রমাণ করেছে।

গণতন্ত্রীর সমস্যা

মার্কসবাদীদের গণতন্ত্র বিরোধী বলার সাথে সাথে তথাকথিত গণতন্ত্রবাদীদের আজ কিছুটা আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শতকরা প্রায় ৪৯ জন ভারতীয় আজ যেখানে দারিদ্র্য-সীমার নীচে দিনাতিপাত করছে, সেখানে বর্তমান স্বাধীনতার কি দাম—এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, এটি দেশদ্রোহিতা

নয়। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, "কোন লোক জোর করে একজনের বিষয় কেড়ে নিয়েছে, এখন বঞ্চিত ব্যক্তি যখন তার বিষয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে তখন প্রথম ব্যক্তি নাকী সুরে চীৎকার শুরু করল, আর মানুষের অধিকার রূপ মতবাদ যে কত পবিত্র তা প্রচার করতে লাগল।"[১] তাই প্রশ্ন, তথাকথিত গণতন্ত্রী যে শক্তির পথে দেশের পরিবর্তন চাইছেন, সে বিষয়ে তাদের মতের ও ক্রিয়াকলাপের যৌক্তিকতা কোথায়? মুনাফাখোর, জোতদার, লোভী ব্যবসায়ীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা যায় তবে তো ভালই, কিন্তু যদি এতে কাজ না হয়? যখন দেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যে ধুঁকছে তখন ঐ মুনাফাখোরদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে মানবিক অধিকার বলব কি না? এবং এ পরিস্থিতি চলতে দেওয়া হবে কিনা? নেহেরু লিখেছিলেন: our final aim can only be a classless society with equal economic justice and opportunity for all. Everything that comes in the way will have to be removed, gently if possible, forcibly if necessary. Autobiography, p.p. 551-52) জয়প্রকাশজীও তাঁর টোটাল রেভলিউশন বইয়ে বলেছেন: If non-violence does not act quickly to end this system, violence will step in. (p. 86) সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটি বড়, না হিংসা অহিংসার প্রশ্নটি বড? সামাজিক সাম্যই যখন লক্ষ্য তখন তার পথে অহিংসা যদি প্রয়োগকুশল না হয়, তবে স্বভাবতই হিংসাত্মক পথের কথা এসে পড়ে। রাইফেলের গুলি কিংবা বাঁশের লাঠিই হিংসার একমাত্র পথ নয়, অন্যকে বঞ্চিত করে তার জীবনধারণের ন্যূনতম পরিবেশ কেড়ে নেওয়া আরও বড় হিংসা। এবং সেই হিংসার জবাব দিতে কেউ উদ্যত হলে তাকে কোন যুক্তিতে দেশদ্রোহী বলব? জাতীয় অর্থ যদি সাধারণ লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয় তবে ধনীদের অর্থকে আওতার বাইরে রাখলে চলবে না। ধনীদের অর্থ জনসাধারণের হয় পেতে হবে (দানের মাধ্যমে) কিংবা নিতে হবে (আইন বা সংঘর্ষের মাধ্যমে)। দানের মাধ্যমে পাওয়া (যাকে অনেকে গান্ধীজীর অছিবাদ বলে প্রচার করেন) কতখানি সম্ভব? ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ৬।২।১৯৩০ সংখ্যায় গান্ধীজী নিজেই বলেছেন: The

great obstacle in the path of non-violence is the presence in our midst of indigenous interests that have spring from British rule, the ınterests of moneyedmen, speculators, land-holders, factory-owners and the like. All these do not always realise that they are living on the blood of the masses.

এ-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্য আরও তীক্ষ্ণ—দরিদ্রগণ যখন ধনীগণের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন শক্তিই দরিদ্রদের একমাত্র ওষুধ।"[২] তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে, ধনীদের অর্থ যদি পাওয়া না যায় তবে তা নিতে হবে। কিভাবে? হয় সংসদীয় আইনের সাহায্যে কিংবা সংঘর্ষের মাধ্যমে। আধুনিক গণতন্ত্রবাদীদের এই কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখী হতেই হবে।

আধুনিক গণতন্ত্রবাদীদের মত হলো—সংঘর্ষ নয়, আইনের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই মতই যথার্থ কারণ হিংসাত্মক কার্যকলাপ একবার শুরু হলে তা কোথায় গিয়ে পরিণতি লাভ করবে তা বলা যায় না। কিন্তু সেই সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে এই পথ কতখানি বাস্তব ও আশু ফলপ্রদ তা তাদের প্রমাণ করতে হবে।

সন্তোষ রানা যখন বলেন, মেদিনীপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে লাভ নেই, তখন তিনি ঠিক কথাই বলেন। পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বেকার যখন পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে সময় তাদের সংখ্যা আরও বাড়াবার জন্য নতুন পরিকল্পনায় লাভ কি? উচ্চ শিক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে দেশের কিছু লাভ হচ্ছে কি? প্রথমত, দেশে নিরক্ষরদের হার যখন প্রায় ৬৩% তখন শিক্ষাখাতে প্রযুক্ত অর্থে এদের দাবী বেশি, না ৫% গ্র্যাজুয়েটের দাবী বেশি। দ্বিতীয়ত, পঞ্চম পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পিছু যে ২২০০ টাকা নিয়োগ করা হয়েছিল তা পাওয়া গিয়েছে কোথা থেকে? সরকারী তহবিল অর্থাৎ দেশের জনসাধারণ এই ব্যয়ভার বহন করেছে। এখন প্রশ্ন, দেশবাসী এইটাকার কতখানি রিটার্ন পাচ্ছে? দেশব্যাপী কয়েক হাজার ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করতে দেশবাসীকে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হচ্ছে, কিন্তু এই উচ্চশিক্ষিতদের একজনও সে কথা মনে রাখেন? আর মনে রাখেন না বলেই গ্রামে ডাক্তার পাওয়া যায় না, হাজার টাকা মাইনের ইঞ্জিনীয়ার বারোশ' টাকার দাবীতে জনজীবনে

বিপর্যয় ঘটান। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি কথা স্মরণীয়—"যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিতর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়া এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটি বার চিন্তা করিবার অবসর পায়না, তাহাদিগকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করি।" প্রশ্ন হতে পারে, গরীবেরা যখন আয়কর দেয় না তখন তাদের টাকায় অন্যে শিক্ষালাভ কথাটির অর্থ কি? আয়কর না দিলেও গরীবেরা পরোক্ষ কর দেয়। ১৯৭৬ সালের বাজেট অনুযায়ী ভারতীয়েরা মাথাকিছু কর দিয়েছে পণ্যদ্রব্যের জন্য ৬৮ টাকা, বিক্রয় কর ১৫-২০ টাকা, চিনির জন্য ৩ টাকা, তামাকে ৫ টাকা, কোরোসিনে ৩ টাকা, তেল ৫০ পয়সা, ওষুধে ৫০ পয়সা, জামাকাপড় ৮ টাকা, দেশলাইয়ে ৫২ পয়সা, বাস ৮ টাকা। অর্থাৎ একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসে মাথাপিছু পরোক্ষ কর কম করেও বার্ষিক ১১২ টাকা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটা খুব সামান্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ১৯৬৩ সালে ভারতীয়দের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল ৩৪১ টাকা। অর্থাৎ দেশের মানুষ মাথাপিছু প্রতিদিন আয় করছে ৯৩ পয়সা এবং এর মধ্যে ৩০ পয়সাই দিয়েছে সরকারকে। তাই শুধু ব্যবসায়ীরা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ও কলেজের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে চলেছে গরীবদের রক্ত-জল-করা পয়সার সাহায্যে। এরা কেবল বেকার ভাতা ও কর্মসংস্থানের জন্য সরকারকে দায়ী করেন, কিন্তু যাদের পয়সায় এরা শিক্ষিত হয়েছেন সেই নিরন্ন দেশবাসীর জন্য এরা কি করছেন?

গণতন্ত্রবাদীরা সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, ভারত কি গরীব দেশ? না, ভারত গরীব দেশ নয়, গরীব লোকের দেশ। ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মাথাপিছু জাতীয় আয় বিশেষ বাড়েনি, অথচ ১৯৫০ থেকে ৭৫ সালের মধ্যে প্রতি বছর ১% হারে এই আয় বেড়েছে। খাদ্য শস্য উৎপাদন ১৯০০-১৯৫০ সালে বেড়েছিল ১ কোটি টন, ৫০-৭৫ সালে বেড়েছে ৬ কোটি টন! অনুরূপভাবে জাতীয় সঞ্চয় ৫% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩%-এ। ১৯৫৫ থেকে ৭১-এর মধ্যে কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদন বেড়েছে ৭০০%, ১৯৬৩ -এ রেফ্রিজারেটারে উৎপাদন বেড়েছে ৬০০%, স্কুটার মোটরসাইকেল ৪০০%, নিয়ন টিউব লাইট ৯০০%, গুঁড়ো সাবান ৩৩০০%, অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই দৃশ্য, ৫ বছরে রেকর্ড প্লেয়ারে উৎপাদন

৩৭০%, ১২ বছরে কর্ণফ্লেক্স জাতীয় খাবার ১৫০% ইত্যাদি। অতএব ভারত গরীব দেশ নয়, অন্তত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির হারের দিকে তাকালে তাই মনে হয়।

তাহলে 'ফ্যালাসি'টা কোথায়? দেশকে উন্নত করার পন্থা হিসেবে দুটি কার্যক্রমের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে—জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার হ্রাস। জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্টের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যার ফলে উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে। পরিণামে পণ্য উৎপাদন বাড়ছে। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণ তাতে কতখানি উপকৃত হচ্ছে? প্রথমত, উন্নত যন্ত্রপাতি চালাবার জন্য দরকার কুশলী শ্রমিক, দরিদ্র অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন এতে মিটছে না। দ্বিতীয়ত, এসব পণ্য দরিদ্র জনসাধারণের কাছে কতখানি ব্যবহার্য? ফ্যালাসিটা এখানেই। সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য জাতীয় আয বৃদ্ধি দরকার, কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেই সামাজিক বৈষম্য দূর হয় না। পাশ্চাত্য দেশগুলির সাথে পাল্লা দিয়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধির ঐ পথ না নিয়ে চিন্তা করা দরকার—দেশবাসীর, বিশেষত দরিদ্রদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু কি কি। এবং এই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বৃদ্ধিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কমবে ঠিকই, কিন্তু সামাজিক বৈষম্য দূর করতে এ-ধরণের পরিকল্পনাই বেশি সাহায্য করবে। গান্ধীজী এ-দিকটির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, বড় বড পরিকল্পনা করে নজর দিতে হবে দেশবাসীর জন্য মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়। প্রতিটি পরিকল্পনার সময় চিন্তা করতে হবে এর দ্বারা দরিদ্রতম দেশবাসী কতখানি উপকৃত হচ্ছে।

গণতন্ত্রবাদীরা ধনীদের ওপর কর বসাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু মধ্যবিত্তদের নিয়েও চিন্তা করার সময় এসেছে। মাথাপিছু বার্ষিক আয় যেখানে সাড়ে তিনশ টাকার মতো বা মাসে প্রায় ২৮ টাকা, সেখানে পরিবার পিছু মাসিক আয় দাঁড়াচ্ছে কম বেশি দেড়শ টাকার মতো (স্বামী, স্ত্রী, তিনটি সন্তানকে নিয়ে)। তাহলে যাদের মাসিক আয় ৬০০ টাকার ওপর, তাদের আয় বৃদ্ধির আরও সুযোগ কেন দেওয়া হবে? দরিদ্রতম দেশবাসীকে যেখানে দৈনিক ৩০ পয়সা হারে কর দিতে হচ্ছে, সেখানে বার্ষিক ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর

কেন ছাড় দেওয়া হবে? মাসিক ১৬০০ টাকা পর্যন্ত আযকারীদের এই অতিরিক্ত সুবিধে দেওয়ায় সরকারের কোন- উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে? এই লোকেরা অতিরিক্ত অর্থে কিনছে রেকর্ড প্লেযার, স্কুটার, টি, ভি, টেপরেকর্ডার, নাইলন টেরিলিন, ক্যামেরা ইত্যাদি। অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভালপমেণ্টের যে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরী হয়েছে, তারই বাজার গরম রাখার জন্য মধ্যবিত্তদের এই বিশেষ সুবিধে দেওয়া হচ্ছে। অথচ স্বামীজী চেয়েছিলেন, যতক্ষণ না দেশের দরিদ্রতম জনতার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে ততক্ষণ অন্য সম্প্রদাযকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। বর্তমান সমাজে কি দেখছি? উপরোক্ত জিনিসগুলিকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রযোজনী দ্রব্য বলে মনে করছে। জাতীয পরিকল্পনা এভাবে বহু লোকের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিযে অবস্থা আরও খারাপ করে তুলেছে। ১৯৫৫ থেকে ৫১ সালেব মধ্যে নাইলন-টেবিলিনের উৎপাদন বেড়েছে ৭০০%, অথচ সূতীবস্ত্রেব ব্যাপারে দেশবাসীরা ১৯৫০ সালে মাথাপিছু যেখানে পেত ১১ মিটাব, ১৯৫৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িযেছিল মাত্র ১৩.৬ মিটারে।

ভারতীয় গণতন্ত্রবাদীদের তাই সতর্ক হওযা প্রযোজন। ক্ষুধার্ত মানুষ বেশীদিন অপেক্ষা করতে পাবে না। দবিদ্র ৫৬% মানুষের ভাগে জুটছে জাতীয সম্পত্তির ২৬%, মধ্যবিত্ত ৩৪%-এব জুটছে ৪৪% এবং উচ্চবিত্ত ১০%-এর ভাগে ৩০%। এই বৈষম্য আর কত দিন চলবে? ভারতেব পথ গান্ধীবাদ না মার্কসবাদ, এই প্রশ্নের চেযেও বড প্রশ্ন, নীচের তলার ৫৬% মানুষকে আর বঞ্চিত কবে রাখা হবে কিনা! এবং এই বঞ্চিত রাখাটা মানবিক অপরাধ ও ক্রাইম কিনা!

মার্কসবাদীর সংকট

ভারতের অ-মার্কসবাদী দলগুলিকে 'বুর্জোয়া' বলে গালাগালি দেবার সাথে সাথে মার্কসবাদীদেরও আজ আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। যে কমিউনিজমকে মার্কস ইউরোপ আমেরিকার পক্ষে উপযুক্ত বলে ঘোষণা করলেন, সেটি আজ এশিয়াতেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল কেন, এ-নিয়ে ভাবা দরকার। মার্কসীয় পন্থা অনুসরণ করে রুশ বিপ্লব হযনি, চীনেও নয়, কিউবাতেও নয়। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও সর্বত্রই দেখা গেছে কতগুলি আকস্মিক ঘটনার ফলে

কমিউনিষ্টরা গদী দখল করেছে। মস্কো ও পেট্রোগ্র্যাডে শ্রমিক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু লেনিন ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিলেন সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল বলেই। কেরেন্সকি যদি সৈন্যদের জমি দেবার আশ্বাস দিতেন, তবে রুশ সৈন্যরা জার্মানদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেত নিজস্ব জমি রক্ষার তাগিদেই। কেরেন্সকির ধারণা ছিল, ঐ যুদ্ধে জয়ী হয়ে তবে সৈন্যদের জমি দেবেন। এটাই ছিল তার ভুল। বলশেভিকরা সৈন্যদের সেন্টিমেণ্ট ধরতে পেরেছিল বলেই সৈন্যবাহিনীর সমর্থন তারা পেয়ে গেল। চীনা বিপ্লবে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। জাপানকে হটিয়ে মাঞ্চুরিয়ায়, শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে রুশ সৈন্যবাহিনী চীনা কমিউনিষ্টদের সাহায্যে এগিয়ে না এলে চীনা বিপ্লব সার্থক হতো না। ১০ বছর ধরে ইয়েনানে স্বীয় প্রভাব রেখেও মাও সে তুং হঠে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন কুওমিণ্টাং সৈন্য বাহিনীর চাপে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কমিউনিষ্টদের গদী দখলে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল বিদেশের সৈন্যবাহিনী, স্বদেশের শ্রমিক-কৃষক নয়। সম্প্রতি আফগানিস্থানেও ঘটল একই ব্যাপার।

শ্রমিক-কৃষকের নাম করে যে-আন্দোলন মার্কসবাদীরা চালান সেগুলিতে মুখ্য ভূমিকা কার? মধ্যবিত্ত নেতাদের। এবং এই নেতাদের অধিকাংশই শ্রমিক-কৃষক সম্প্রদায়ের লোক নন। একথা যেমন ১৯১৭-১৯ সালের রাশিয়া বা ১৯৪৫-৪৭ সালের চীন সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তেমনি ইউরোপ ও সাম্প্রতিক ভারত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এশিয়ার দেশগুলির দিকে যদি তাকানো যায়, দেখা যাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই কমিউনিজমের মূল প্রবক্তা। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের দুটি মানসিক দিক লক্ষ্যণীয়। একদিকে এরা সামাজিক ন্যায়ের সমর্থক, অন্যদিকে সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্খী শ্রেণী। এরা জানেন, সর্বহারার একাধিপত্য আসলে এদেরই একাধিপত্যে পরিণত হবে। এরা যখন কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন তখন সামাজিক ন্যায়ই এদের লক্ষ্য থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে সেই লক্ষ্যের আসন গ্রহণ করে ক্ষমতার লোভ ও নেতৃত্ব-স্পৃহা। এই মনস্তাত্তিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয়! এশিয়ার দেশগুলির ইতিহাসে দেখা যায় যে অতীত যুগ থেকে অধিকাংশ দেশে গণতান্ত্রিক চেতনা বিশেষ ছিল না। রাজনৈতিক দিক থেকে এসব দেশের লোকের মানসিকতা প্রায় মধ্যযুগীয় এবং একনায়কত্ব এদের আকৃষ্ট করে।

এই দেশগুলির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও এই মানসিকতা থেকে মুক্ত নয়। ফলে গণতান্ত্রিক পরিবেশে দুর্নীতি এসব দেশে সহজেই ব্যাপক হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ মানুষই মনে করে যে কেবল একনায়কত্বই দেশের উন্নতি বিধান করতে সক্ষম। এশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক মানসিকতার এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কমিউনিজম এখানে ছড়াতে পারছে। বিপরীত দিকে ইউরোপ আমেরিকায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অত্যাধিক প্রভাব থাকায় কমিউনিজম সেখানে বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না। আফ্রিকায় অগুন্তি ছোট ছোট রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ এবং সেখানে কমিউনিজমের তাত্ত্বিক প্রচার যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও আফ্রিকার কোন রাষ্ট্রে একচেটিয়া কমিউনিষ্ট শাসন দেখা যাচ্ছে না কেন? কারণ, আগেই বলেছি, কমিউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করে আসছে বিদেশের সৈন্যবাহিনী, স্বদেশের শ্রমিক কৃষক নয়।

গণতন্ত্রবাদীরা সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না—মার্কসবাদীদের এই অভিযোগ মিথ্যা নয় ঠিকই, কিন্তু মার্কসবাদীরা নিজেরা কি করছে? যে শ্রমিক কৃষকের দুঃখে তারা পাগল, সেই শ্রমিক কৃষকের নিরক্ষরতা দূরীকরণে বা উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে তারা কি করছেন? তারা যেটুকু কাজ করেন তার মূল লক্ষ্য পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি। মার্কসবাদীরা শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে পার্টিকে ব্যবহার করেন অথবা পার্টির স্বার্থে শ্রমিক-কৃষককে ব্যবহার করেন, এই কঠিন প্রশ্নকে তারা এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাদের নানা সংগঠন আছে ঠিকই, কিন্তু নীল-কালার শ্রমিকদের বা সাদা-কলার বাবুদের মধ্যে তারা শ্রেণী চেতনার সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মধ্যবিত্ত ও যুব সম্প্রদায় যে বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে আজকের সমাজে দণ্ডায়মান, সে-সমস্যার সমাধানে গণতন্ত্র-বাদীদের মতো মার্কসবাদীরাও সমান ব্যর্থ।

লক্ষ্যে পৌঁছুবার সময় কমিয়ে আনতে গিয়ে মার্কসবাদীরা প্রতিষ্ঠা করেন স্বীয় একনায়কতন্ত্র। এটিই সবচেয়ে বড় সমস্যা, কারণ একনায়কতন্ত্রের রূপ যা-ই হোক না কেন, একবার এটি চেপে বসলে তাকে সরানো মুস্কিল। জনগণের স্বার্থের দোহাই দিয়ে একনায়কতন্ত্র ক্রমশই নিজেকে হিপ্নোটাইজড করে। ফলে দৃষ্টি হয় অস্বচ্ছ; চারদিকে স্তাবকের দল ভীড় করে, বিরোধী যুক্তিসংগত মন ও বক্তব্যকে মনে হয় ষড়যন্ত্র কিংবা বিদ্রোহ; ক্রমশই নিজের ওপর দেবত্ব আরোপ করে, ফলে বিশেষ অধিকার রূপ অন্যায়ের সৃষ্টি হয়; জনগণের শক্তি

সামর্থ্যের ওপর আস্থা নষ্ট হয়, ফলে নির্ভরশীল হয় ওঠে সৈন্যবাহিনী, আমলাবৃন্দ, গুপ্তচরদের ওপর।

বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্য শ্রমিক-কৃষকদের লক্ষ্য করে লেখা হয় না বলে মার্কসবাদীরা প্রায়ই অভিযোগ করেন। কিন্তু মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্যের প্রকৃত অবস্থাটা কি? তাদের হাতে তো অসংখ্য দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকা, বহু নাট্যগোষ্ঠি। কিন্তু সাম্প্রতিক ভারতের মার্কসবাদী শিল্প সাহিত্য কি শ্রমিক-কৃষকের জন্য রচিত হয়? শ্রমিক-কৃষকের কথা সেখানে বলা হয় না একথা বলছি না, কিন্তু ঐসব নাটক-সাহিত্য রচনা করার সময় ধরে নেওয়া হয়, দর্শক ও পাঠকেরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। সুকান্ত থেকে শুরু করে হাল-আমলের রুদ্রেন্দু, অনন্ত, অমিতাভ, গোপাল, বীরেন্দ্র প্রমুখ মার্কসবাদীদের কবিতার রস গ্রহণ করা কি গ্রামের কৃষক বা খনি শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব? আর নাটকে যতই বিপ্লবের কথা থাক, গ্রামের মানুষের কাছে এসব নাটকের চেয়ে পৌরাণিক যাত্রা অনেক বেশি সমাদর লাভ করে। মার্কসবাদীরা বলতে পারেন, শিক্ষার অভাবই এর মূলে রয়েছে। ঠিক কথা, কিন্তু গ্রামের কৃষক কিংবা খনি ও চটকলের শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য মার্কসবাদীরা কি করেছেন? সমস্যাটা আসলে অন্যত্র। তাদের শহুরে মানসিকতাই তাদের বাধ্য করছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের দিকে তাকিয়ে এসব শিল্প সাহিত্য রচনা করতে। রুদ্রপ্রসাদ, সৌমিত্রের নাটক কিংবা ঋত্বিক মৃণালের সিনেমা শ্রমিক কৃষকের উপযোগী নয় এই কারণেই।

স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি

আমরা দেখতে পেলাম, প্রচলিত মত ও পথগুলি প্রধানত দুটি কারণে অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। প্রথমত, এগুলি কোন না কোনভাবে শক্তির কেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেয়; দ্বিতীয়ত, মানুষকে অর্থনৈতিক জীব বলে গণ্য করে। মানুষের সত্তা তিনটি স্তরে বিস্তৃত—শারীরিক, মানসিক, এবং ব্যৈক্তিক। শারীরিক স্তরে উন্নতির জন্য চাই খাদ্য, গৃহ ইত্যাদি, মানসিক স্তরের জন্য চাই শিক্ষা। আর ব্যৈক্তিক স্তরে উন্নতির ফলে মানুষ হয় বুদ্ধ, অশোক, লিংকন, লেনিন, আইনষ্টাইন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ। রাষ্ট্র মানুষকে সাহায্য করতে পারে কেবল শারীরিক ক্ষেত্রে ও অংশত মানসিক স্তরের উন্নতির ক্ষেত্রে, কিন্তু

ব্যৈক্তিক স্তরে উন্নতির জন্য রাষ্ট্র সরাসরিভাবে সাহায্য করতে পারে না। সাধারণভাবে রাষ্ট্রশক্তিগুলি খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করেই তৃপ্ত থাকতে চায়। ব্যৈক্তিক উন্নতির দিকে নজর না দেওয়া হলে রাষ্ট্রে শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান মানুষের আধিক্য হতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাবানের সংখ্যা কমে আসে। রাষ্ট্রশক্তি যদি মানুষের জীবনের সর্বস্তরে হস্তক্ষেপ করে, তবে মানুষের স্বাধীন বিকাশ ব্যাহত হয়। স্বামীজী বলেছেন, স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। এদিকে তাকিয়েই স্বামীজী এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলেছেন, যেখানে, শক্তির কেন্দ্রীয়করণের কোনরকম সম্ভাবনা থাকবে না এবং মানুষের স্বাধীন বিকাশের পরিবেশ বজায় থাকবে। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ, যাকে আমরা বিপ্লবী কার্যকলাপ বলতে পারি, সেই পথও এমন হওয়া দরকার যাতে উদ্দেশ্যের সাথে উপায়ের পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে, অর্থাৎ বিপ্লবের পথেও যেন কোন একনায়কের আবির্ভাব না হয়। স্বামীজী-নির্দেশিত বিপ্লবে বিপ্লবীদের মনে রাখতে হবে জনসাধারণের সৃজনী শক্তির অপরিসীম ক্ষমতা আছে, বিপ্লবের জন্য নির্ভর করতে হবে জনসাধারণের ওপর। অর্থাৎ বিপ্লব আনবে জনসাধারণই, অগ্রণী বিপ্লবী যুবকেরা কেবল অনুঘটক (ক্যাটালিষ্ট) হিসেবে কাজ করবে। বিপ্লবীদের প্রধান কাজ হবে গণ-চেতনার প্রসার ঘটানো। ধৈর্য সহকারে এই গণ চেতনার প্রসার ঘটিয়ে জনসাধারণকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে, বাধা-বিঘ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা যাতে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার সাহায্যে সেগুলিকে জয় করতে পারে সেভাবে তাদের অনুপ্রেরণা জোগাতে হবে। ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়ে জনসাধারণ যদি এভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, তাহলে এরাই হাত দেবে বড় বড কাজে। আসলে, যাদের জন্য বিপ্লব তাদেব উৎসাহিত করে তুলতে হবে। বিপ্লবীরা যদি জনসাধারণের সাথে একাত্ম হয়ে যায়, জনসাধাবণের মাথার ওপর না দাঁড়িয়ে তাদের সহকর্মী হয়ে ওঠে, বিভিন্ন পন্থায় তাদের চেতনার ও কর্মশক্তির জাগরণ ঘটাতে প্রবৃত্ত হয়, সর্বোপরি, বর্তমান পরিস্থিতি ও আদর্শ পরিস্থিতিকে পাশাপাশি তুলে ধরে, তাহলেই ক্রমে জনসাধারণই হয়ে উঠবে বিপ্লবী। মনে রাখতে হবে, বিপ্লব প্রথমে উদ্দীপিত করে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে। এরপর এই উদ্দীপনা সাড়া জাগিয়ে আরও বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে, এবং শেষে জাগরণ সঞ্চারিত

হয় সমগ্র সমাজে। এভাবেই ভাব-বিপ্লব পরিণত হয় কর্ম-বিপ্লবে। বিপ্লবের এই ক্রমবিকাশকে স্বীকার না করে, জোর করে জনসাধারণের ওপর বিপ্লব চাপিয়ে দিলে তা হবে হঠকারিতারই নামান্তর। জনসাধারণের কাছে শিক্ষা নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বিপ্লবীদের, তাদের চিন্তা-কর্ম-অভিজ্ঞতাকে সুষ্ঠু ও বোধগম্য নীতিসূত্র ও পদ্ধতিতে তুলে ধরতে হবে, সহমর্মী হয়ে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তারা নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে নিজেরাই এগিয়ে আসে।

শক্তির কেন্দ্রীকরণ এবং মানুষকে অর্থ নৈতিক জীব বলে ধরায় বিশ্ব বিপ্লবের মধ্যে যে ভ্রান্তি এসেছে, তা দূর করার জন্য প্রয়োজন স্বামীজী নির্দেশিত বিপ্লবের। চলতি গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি রাষ্ট্র ব্যবস্থার নতুন দিগন্তের সন্ধান দিলেও ক্রমে এগুলিই হয়ে পড়েছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উৎস। এর ফলে এই রাষ্ট্রগুলি ক্রমশ সুপার পাওয়ার হয়ে ওঠার চেষ্টা করে এবং এইভাবে বিশ্ব পরিস্থিতিকে করে তোলে অগ্নিগর্ভ। আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ব মানবিকতাই যে নাগরিকতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ—এ কথা এই শক্তিগুলি ভুলে গেছে। স্বামীজীর মতে, জাতি হিসেবে গড়ে ওঠা প্রাথমিক কর্তব্য, কিন্তু এর লক্ষ্য হবে আন্তর্জাতিকতা।' বিশ্ব সংস্কৃতির বহুতন্ত্রী বীণায় নিজস্ব সুর তাকে বাজাতে হবে নিখুঁতভাবে-সমগ্র সুর লহরীর দিকে লক্ষ্য ও সামঞ্জস্য রেখে। মানুষকে দেখতে হবে কিভাবে অন্যান্য জাতি এগিয়ে চলছে, বিশ্বের চিন্তাধারার সাথে রাখতে হবে অবাধ আদান-প্রদান, বিশ্বের প্রতিটি ঘটনা থেকে তাকে শিক্ষা নিতে হবে। ভগিনী নিবেদিতাকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন "এই আন্তর্জাতিক মেলামেশার ভাবটা খুব ভাল—যেভাবে পারো এতে যোগ দাও। আর যদি তুমি মাঝে থেকে ভারত রমণীদের সমিতি-গুলিকে ঐ কাজে যোগ দেওয়াতে পারো তবে আরও ভাল হয়।"[৭] এই আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ব-মানবতার আদর্শের অনুসারী না হওয়ায় 'গণতন্ত্রের পূজারী' আমেরিকা বৃটেন বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপনে এখনও আগ্রহী। বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধে 'সাম্যবাদী' চীন সমর্থন করেছিল স্বৈরতন্ত্রী সামরিক সরকারকে, ভারতে জরুরী অবস্থার সময় 'সমাজতন্ত্রী' রাশিয়া ও ভিয়েতনাম তৎকালীন ভারত সরকারকে সমর্থন ও সাহায্য করেছিল। আবার দেখুন, রাশিয়া প্রথমদিকে তিব্বতকে চীনের অংশ হিসেবেই গণ্য করেছিল, কিন্তু

১৯৭৯ সাল থেকে তাদের মনোভাব পাল্টে যায়। রাষ্ট্রপুঞ্জে চীন-ভিয়েৎনাম যুদ্ধ নিয়ে বিতর্কের সময় রুশ প্রতিনিধি বলেন যে পঞ্চাশের দশকে চীন তিব্বতকে আক্রমণ করে অধিকার করেছিল। ১৯৮০ সালে রুশ নেতা এল-ভি সেরবাকোভ বলেন যে তিব্বতীরা মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য চাইলে রাশিয়া তা দিতে রাজি। 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকা বৃটেন ফ্রান্স এবং 'সাম্যবাদী' রাশিয়া চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে আজও ভেটো-ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে আছে। বিশ্বের সব রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিলেও এই পাঁচটি রাষ্ট্রের যে কোনও একটি ভেটো দিয়ে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারে—এই বিশেষ স্থবিধাবাদের সমর্থক আজ এই সুপার পাওয়ারগুলি নিজেরাই। এইভাবে আমরা দেখতে পাই, বৃহৎশক্তি রাষ্ট্রগুলি কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য দেখাতে পারছে না, স্বীয় স্বার্থ রক্ষায় অন্যায় করতে দ্বিধা বোধ করছে না, এবং এভাবে বিশ্ব পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে।

এই ক্রটির আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে বলেন, এর জন্য দায়ী ঐ রাষ্ট্রগুলি, তাদের আদর্শ নয়। কথাটি ঠিক নয়। রামমনোহর লোহিয়া যথার্থই বলেছেন, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ অর্থনৈতিক লক্ষ্যে একই পথের পথিক। সাম্যবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও শক্তিসমূহই অনুসরণ করা হয়, শুধু উৎপাদনের সম্পর্কে পরিবর্তন আসে। ব্যাপক উৎপাদন, দক্ষতা ও উচ্চ বেতনের ব্যাপারে স্টালিন ও ফোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো তফাৎ নেই। (স্বদেশে সমাজবাদ—(সঃ) ডঃ সজল বসু, পৃঃ ৪৯)। স্বদেশীয় শ্রমিক কৃষকের শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য গ্রহণ করেই চীন রাশিয়া আজ সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়েছে। এবং এই শক্তিমত্তা রাষ্ট্রনেতাদের ঠেলে দিয়েছে সংকীর্ণ জাতীয়তা-বাদে ও পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এরাও নতুন ধরণের পুঁজিবাদী হয়ে উঠছে। আসলে পুঁজিবাদী ও মার্কসীয় উভয় ধরণের রাষ্ট্রগুলিই এক ধরণের এস্টাব্লিশমেন্টের শিকার হয়ে পড়েছে। স্বামীজী-নির্দেশিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেহেতু এ-ধরণের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি কোনও বিশেষ অহং-বোধের আশ্রয় দিচ্ছেনা, সেহেতু এটি এস্টাব্লিশমেন্টের শিকারও হয়ে পড়বে না।

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী

সাম্প্রতিক বিশ্বের কতগুলি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত বিপ্লবী

মতবাদগুলি খুবই অসহায় হয়ে পড়েছে। মার্কস থেকে মাও সে তুং, গুয়েভারা পর্যন্ত মার্কসবাদের যে বিভিন্ন ধারা দেখা গেল, কিংবা রাসেল-সাত্রে´-জ্যাক কেরুয়াক যে নতুন পথের হদিশ দিতে চেয়েছেন, এইসব মতগুলি আলোচনা করলেই বোঝা যায় পৃথিবীর সামাজিক চেহারাটা আগের চেয়ে জটিল হয়ে পড়েছে। একদিকে মাও সে তুং তুলে ধরেছেন কৃষিনির্ভর অনুন্নত সমাজের কথা, অন্যদিকে হার্বার্ট মারকিউস তন্ন-তন্ন করে বিশ্লেষণ করেছেন উন্নত দেশগুলির অ্যাফ্লুয়েণ্ট সমাজের কথা। তাই আজকের বিপ্লবী-চিন্তায় কোনো একটি বিশেষ দেশ বা জাতির কথা আলোচনা করলে হবেনা, প্রয়োজন বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরা। এই সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে কতগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে তুলে ধরতে পারি।

প্রথম বৈশিষ্ট্য, যুবসমাজের আয়তন বৃদ্ধি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এদের গুরুত্বপূর্ণ অথচ অসহায় ভূমিকা। ভিয়েৎনামে মার্কিন তরুণদের প্রতিবাদ, ফ্রান্সে ছাত্রবিদ্রোহ, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, ভারতে নকশালপন্থী আন্দোলন, যুব-কংগ্রেস, যুব সংঘর্ষ ও ছাত্র সংঘর্ষ বাহিনীর অভ্যুদয়, ইরানে শা'র পতন ইত্যাদি কয়েকটি ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যুবশক্তির সম্ভাবনা ও তীব্রতা। এদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহে উপরোক্ত দেশগুলিতে সামাজিক চেতনার এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেইসাথে এটিও লক্ষণীয় যে এই বিদ্রোহ বা বিক্ষোভের শেষে যুব সমাজ লাভবান হয়নি, নেতৃত্ব চলে গেছে সাবেকী ধ্যান-ধারণাধারী মানুষের হাতে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি একই রকম আচরণ করছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে অগণতান্ত্রিক বৈষম্যবাদী ভেটো-ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে, বিদেশী রাষ্ট্রে পুতুল সরকার বসানোর ব্যাপারে, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিতে অস্ত্র বিক্রীর প্রতিযোগিতায়, পররাষ্ট্রনীতিতে উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ায়, এবং বিদেশী রাষ্ট্রে জনসাধারণের পরিবর্তে সামরিক সরকারকে সমর্থন করার ব্যাপারে আমেরিকা-বৃটেন-ফ্রান্সের সাথে রাশিয়া-চীনের কোনও পার্থক্য নেই।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, মুক্তমতি বুদ্ধিজীবীদের ওপর সরকারী অত্যাচার ক্রমশই বাড়ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও পরে পরমাণু

বৈজ্ঞানিকেরা, এবং পরবর্তীকালে সলঝেনিৎসিন-শাখারভ নির্যাতিত হয়েছেন। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে, ভারতে জরুরী অবস্থায়, দঃ ভিয়েৎনামের কমিউনিষ্ট-শাসনে, চিলিতে অ্যালেণ্ডে সরকারের পতনের পর, সর্বত্র মুক্তমতি বুদ্ধিজীবীদের ওপর আক্রমণে উৎসাহ দেখিয়েছে গণতন্ত্রী-সাম্যবাদী সব রকমের সরকারই।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, প্রযুক্তি শিল্পের অভিনব উন্নতির সাথে সাথে কনজিউমারিজমের বিকাশ, শহর থেকে গ্রামে এর প্রসার, এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কাছে এর অদম্য আকর্ষণ। ইওরোপ-আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী এর প্রভাবে কিভাবে চরিত্র হারিয়েছে সে-কথা অন্যত্র আলোচনা করেছি। এরই ফলে রাশিয়ার তরুণ-সমাজে ইয়াংকি-ঢেউ ও রাজকাপুরের জনপ্রিয়তা। অনুন্নত দেশগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। কনজিউমারিজমের এই ব্যাপক প্রভাব জনচেতনায় যে সামগ্রিক প্রভাব ফেলেছে, তাকে কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবের সাথে সাথে পাইয়ে দেবার রাজনীতি তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিতে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, মালিক-শ্রমিকের পূর্ব সম্পর্কের স্বচ্ছতা নতুন সমাজব্যবস্থায় ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জয়েন্ট-স্টক কোম্পানী বা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে মূলধনের গোত্রান্তর ও মালিকানা-পরিচালনার বিচ্ছেদ ঘটলেও মালিকের শোষণ বন্ধ হয়নি এবং ম্যানেজার ও শ্রমিকের সামাজিক ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে। কমিউনিষ্ট শাসন ব্যবস্থায় মূলধনে ব্যক্তিগত আধিপত্যের সুযোগ না থাকলেও মন্ত্রী, পরিচালক ও শ্রমিকদের মধ্যে যান্ত্রিক শাসক-শাসিত সম্পর্কের উদ্ভব ঘটেছে এবং নতুন ধরণের শ্রেণীবিন্যাস ঘটেছে। তৃতীয় বিশ্বে মিশ্র-অর্থনীতির দেশগুলিতে অ-শ্রমিক শ্রমিক-নেতাদের উদ্ভব, ইউনিয়ন-নেতা ও মালিকের 'বোঝাপড়া'র সম্পর্ক, পাইয়ে দেবার রাজনীতি ও কর্মবিমুখতা সামগ্রিকভাবে অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। ফলে নতুন ধরণের এক শোষণ যাকে বলা যায় জনসাধারণের ওপর মালিক-শ্রমিক যৌথ শোষণ, আজ প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পারস্পরিক বোঝাপড়ায় প্রতিটি দেশকেই অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কর্পোরেট ধনীরা, কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে পারটি কর্মকর্তা, একজিকিউটিভ-ব্যুরোক্র্যাটরা, এবং তৃতীয় বিশ্বে

পেশাদার রাজনৈতিক নেতারাই সমাজের মূল পরিচালক হয়ে উঠেছেন। দেশের যুবশক্তিকে এরা নিজেদের ইচ্ছেমতো গড়ে তুলতে ও পরিচালনা করতে চান, যার ফলে তরুণ সমাজ অসীম সম্ভাবনাময় হয়েও বিপথগামী হচ্ছে। Frantz Fanon-এর The Wretched of the Earth বইয়ের ভূমিকায় জঁা-পল সার্ত্রে মন্তব্য করেছিলেন, "The European elite undertook to manufacture a native elite. They picked out promising adolescents ; they branded them as with a red-hot iron, with the principles of western culture ; they stuffed their mouths full with high-sounding phrases···These walking lies had nothing left to say to their brothers ; they only echoed." একই কথা আজ বলা যায় সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর লেখায় 'চলমান শ্মশান' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, সার্ত্রে ব্যবহার করেছেন 'walking lie' শব্দটি। রাষ্ট্রের এই তথাকথিত নেতারা বা পরিচালকেরা তরুণ সম্প্রদায়কে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেন, সংগ্রাম তারাই করে, হতাহত তারাই হয়, আর লাভবান হন নেতারা। একদিকে কনজিউমারিজমের প্রলোভন, অন্যদিকে আদর্শের ছদ্মবেশে অন্ধবিশ্বাস ও উগ্র দেশপ্রেম বা দলপ্রীতি শিখিয়ে বারবার এই যুবশক্তির অপব্যবহার করা হচ্ছে।

মানসিক রূপান্তর না ঘটিয়ে শুধু শাসনব্যবস্থা বা সমাজব্যবস্থা পাল্টালে তার ফল শুভ হয় না। ১৯৬২ সালের নভেম্বরে ক্রুশ্চেভ নিজ দেশের দুর্নীতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন : ঘুষ বিভিন্ন ব্যাপারে দেওয়া হয়, যেমন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বিক্রির জন্য, বাড়ী তৈরির পারমিট আদায়ের জন্য, জমি দেওয়ার ব্যাপারে, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে, এমনকি ডিপ্লোমা বিতরণের ক্ষেত্রেও ; ···এই দুর্নীতি, এই ঘুষের চল আমাদের কেন্দ্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানেও অনুপ্রবেশ করেছে যাতে বহু উচ্চপদস্থ পার্টি সদস্যও জড়িত আছেন (প্রাভদা ২০-১১-৬২)। কলকাতার চীনপন্থী পত্রিকা 'লালতারা' তার ৭-৬-৬২ সংখ্যায় মন্তব্য করেছিল, "বস্তুত চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির সমগ্র ইতিহাসটাই··· সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু এই মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। অধিকাংশ নেতাই একটি ঐতিহাসিক কালখণ্ডে তাঁদের

ইতিবাচক ভূমিকা রেখে গেছেন, বিপ্লবকে এগিয়েনিয়ে গেছেন, কিন্তু পরবর্তী-কালে তাদের মধ্যকার বিপ্লব-বিরোধী ঝোঁক ক্রমশঃ বাড়তে শুরু করে এবং পরিশেষে প্রতিবিপ্লবীতে পরিণত হয়ে পড়েন।" সাম্প্রতিককালে চীনে 'গ্যাং অব ফোর'-এর বিচারে দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং মাও সে তুংও বহু ভুল করেছিলেন যার ফলে হাজার হাজার চীনা জনতাকে হত্যা করা হয়েছিল, লক্ষাধিক শ্রমিকের চাকরী কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এখনও চীনে শ্রমিক শিবিরে ৫০ হাজার দাস শ্রমিক রয়েছে। পুঁজিবাদী দেশগুলির দুর্নীতি নিয়ে আলাদা প্রমাণ দেবার দরকার নেই, কারণ তা পাঠকের জানা বিষয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানসিক রূপান্তর বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ওপর দৃষ্টি না রাখলে সব বিপ্লবই ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিপ্লবের এই প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা মনে না রাখাতেই সাম্প্রতিক বিপ্লবীরা এক সমস্যা থেকে আর এক সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন। ভারত-ইতিহাসের আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী বুদ্ধদেবকে বিপ্লবী বলে বর্ণনা করেছেন। বুদ্ধদেবের মূল প্রয়াস ছিল জনসাধারণের মানসিকতায় রূপান্তর আনা। একদিকে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে তিনি যেমন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, অন্যদিকে গতানুগতিক সাংসারিক জীবনের বিরুদ্ধেও ছিল তাঁর বিদ্রোহ। তাঁর এই বিদ্রোহী মনোভাব তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন জনসাধারণের মধ্যে, সমাজ ব্যবস্থায়।

বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত বিপ্লবে সাম্প্রতিক বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে কি করে? প্রথমত, মুক্ত চিন্তার ধারা বেয়ে যুবশক্তি স্বীয় নেতৃত্ব গড়ে তুলবে অনুঘটক (catalyst) হিসেবে। ফলে একদিকে শ্রমিক-কৃষক, অন্যদিকে নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তদের নিয়ে সংগঠনগুলি গড়ে উঠবে। সেগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েও গণতান্ত্রিক রীতিতে পরিচালিত হবে চিরস্থায়ী নেতার ধারণা বাতিল করে দিয়ে। দ্বিতীয়ত, উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় না দেওয়ায় বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়বে, রাজনীতির চেয়ে মানবতাবাদ হবে সব কিছুর মানদণ্ড। তৃতীয়ত, স্বাধীন চিন্তার প্রতি আগ্রহ থাকায় মুক্তমতি বুদ্ধিজীবীদের ওপর আক্রমণ বন্ধ হয়ে দেশে সুস্থ পরিবেশ তৈরী হবে। চতুর্থত, খাওয়া-পরার সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ জীবন-জিজ্ঞাসায় আগ্রহী হবে, অবচেতন মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ভোগমুখী একদেশী জীবনযাত্রা ছেড়ে বিলাসী

না হয়ে জ্ঞান তাপস হবে। পঞ্চমত, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধনগত বা পদমর্যাদাগত শ্রেণীবিন্যাস লুপ্ত হয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে আসবে। আধুনিক বিপ্লব-তাত্ত্বিকদের মধ্যে মারকিউজ, ছত্রে, ওপেনহাইমার, ফ্যানন প্রমুখ চিন্তানায়কেরা নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা সকলেই মোটামুটি একই পথের দিশারী। তাঁরা যে সন্ধান দিয়েছেন তা বর্তমান যুগকে লক্ষ্য করে এবং তারা শেষ পর্যন্ত নৈরাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। ধনতান্ত্রিক বিলাসী সমাজ সম্পর্কে মার্কস যে কথা বলেছিলেন, মারকিউজের বিশ্লেষণ তার চেয়ে অনেক গভীর। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে, যেখানে গ্রামীণ লোকদের সংখ্যাই বেশি, সেখানে মারকিউজ-ফ্যাননের পথ নির্দেশ অসম্পূর্ণ। আর ছত্রে-ওপেনহাইমার-গুয়েভারা মানবপ্রেমিক হয়েও রোমান্টিকতার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। বাকী রইলেন সমাজতান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক-তৃতীয় বিশ্বের মার্কসবাদীরা। ধনতান্ত্রিক-দেশের মার্কসবাদীরা ইওরো-কমিউনিজমের আড়ালে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মত প্রচার করে যাচ্ছেন এবং অন্তর্বিরোধের ফলে কার্যক্রম নিয়ে ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ফ্রান্সে ১৯৬২ সালে ছাত্র বিদ্রোহকে শ্রমিকদের একাংশ সমর্থন করলেও ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি এর প্রতিবাদ করেছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারী মার্কসবাদীরা একদিকে 'ধীরে চলো' নীতির উপাসক হয়ে পড়েছেন, অন্যদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদী হয়ে বিদেশী রাষ্ট্রের জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ধীরে চলো নীতির প্রথম প্রবক্তা হলেন স্তালিন যিনি Economic problems of Socialism in the USSR বইয়ে বললেন, উচ্চ প্রযুক্তিগত কৌশলে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের নিখুঁত বিস্তৃতির মধ্য দিয়েই রাশিয়া তার স্বর্গরাজ্যে পৌঁছুবে, এর জন্য কোনও সামাজিক বিক্ষোভ বা সংগ্রামের প্রয়োজন নেই। ফলে যারা বিক্ষোভ করার চেষ্টা করেন, তাদের হয় পার্জ (purge) করে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে রাশিয়ার বহু উচ্চপদস্থ সেনাপতিদের স্তালিন যা করেছিলেন বা ক্রুশ্চেভকে পরবর্তী নায়কেরা যা করলেন) কিংবা সামাজিক অত্যাচার চালিয়ে (সলঝেনিৎসিন-শাখারভের কপালে যা জুটেছে) নিজের গদী অটুট রাখার চেষ্টা হয়। তৃতীয় বিশ্বের মার্কসবাদী নেতাদের সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করেছি।

মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক পথের মূল সমস্যাটা কোথা ? বিপ্লবকে ত্বরান্বিত

করার জন্য তারা শ্রমিক-কৃষকের সাংস্কৃতিক উন্নতি না ঘটিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন (কতগুলি রঙীন শ্লোগান দিয়ে দলে রেখে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে। ফলে বিপ্লবে সাফল্য লাভ করার পর দেশের সর্বত্র যে কমিটি গড়ে তোলেন, তাতে কিছু শ্রমিক-কৃষক থাকলেও নেতৃত্ব দেওয়া হয় পার্টি মেম্বারদের ওপর। এই নেতারা অধিকাংশই পেশাদারী রাজনীতিবিদ এবং তাদের আশু প্রচেষ্টা হয় পার্টি-নির্দেশ ত্বরান্বিত করা। এইভাবে শ্রমিক-কৃষক তথা নিম্নবিত্ত জনসাধারণ যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা তাদের মতামত প্রকাশ করার ব্যাপারে পিছিয়ে পড়েন। বিপরীত দিকে, পার্টি-নির্দেশ ত্বরান্বিত করার নামে, কমিটি-নেতারা স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন, যার ফলে নতুন ধরণের আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের ওপর আর্থিক ও সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে ম্যানেজার-ব্যুরোক্র্যাটদের আধিপত্য বিস্তার হতে থাকে, এরা কেবল পার্টি-নেতাদের কাছেই জাবাবদিহি করতে বাধ্য। এইভাবে শ্রমিক-কৃষক তথা নিম্নবিত্ত জনসাধারণ ক্রমশঃ অলক্ষ্যে সরে যেতে থাকে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ইতিহাস এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে। পূর্ব ইওরোপেও একই অবস্থা। এই অদ্ভুত পরিস্থিতির সাথে মিলিত হয়েছে উগ্র জাতীয়তাবাদ। রাশিয়া-চীন-রুমানিয়া ইত্যাদি মার্কসবাদী দেশগুলি আজ অহি-নকুল সম্পর্কে এসে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ, মার্কসের শ্রেণী-সংগ্রাম বা আধুনিক মার্কসবাদীদের সংশোধনবাদ ততটা নয়, যতটা উগ্র জাতীয়তাবাদ। সমাজতন্ত্র যদি ন্যাশানাল হয় তবে তার চূড়ান্ত রূপ কি হতে পারে তা দেখা গিয়েছিল হিটলারের জার্মানীতে। বর্তমানে মার্কসবাদী দেশগুলিতেও এই ন্যাশনাল সোসালিজমের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। সেজন্যই বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর চিন্তানায়কেরা যাঁরা রাশিয়ার গুণগ্রাহী ছিলেন—যেমন রাসেল, মানবেন্দ্রনাথ রায়, রবিঠাকুর—তাঁরা রাশিয়াতে গিয়ে নিজস্ব মত পালটে ফেলেছিলেন। মার্কসবাদের এই ত্রুটি দূর করার পন্থা পাওয়া যায় বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মধ্যে। বিপ্লব কার্যকরী করার সময় বিপ্লবীরা যদি অনুঘটক (catalyst) হিসেবে কাজ করে, চিরস্থায়ী নেতার বদলে জনসাধারণের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী সঞ্চারিত করতে পারে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব মুষ্টিমেয় লোকের হাতে না দিয়ে, জনসাধারণের ওপর দেয়, এবং এভাবে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তবেই প্রকৃতভাবে জনসাধারণের শাসন প্রতিষ্ঠিত

হবে। স্বামীজী তাই দুটি বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন: আমাদের ত্রুটি—আমরা ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চাই, এবং আমাদের পরে কি হবে তা নিয়ে ভাবি না।

গান্ধী-অরবিন্দ-মানবেন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ

এখানে কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা' বইয়ে (পৃ:২৩) লিখেছেন—"বিশ্বের রাষ্ট্রচিন্তার ভাণ্ডারে এদেশের তিনটি মৌলিক অবদান অস্বীকার করা যায় না:

"১ গান্ধীর সর্বোদয় দর্শন, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মানুষের বিবেক ও নৈতিকতার আশ্রয়ে যাবতীয় অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহ পদ্ধতি।

২. অরবিন্দের 'অতিমানস'-প্রত্যয়ের ভিত্তিতে বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা এবং রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়ধর্মী আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজনীন মৈত্রীর আদর্শ।

৩. বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বের সাহায্যে যুক্তি, নীতি ও মুক্তির আদর্শে চরিত মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদ দর্শন।"

গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ এবং এম. এন. রায়ের রাষ্ট্রচিন্তায় মৌলিক ভাব আছে এবং সদার্থক চিন্তাও কম নয়। স্বামী বিবেকানন্দের সাথে এঁদের চিন্তাধারার অনেক মিল আছে, অমিলও প্রচুর। এখানে কয়েকটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

শ্রীঅরবিন্দ একটি বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং এই লক্ষ্যে পেঁছবার অন্তর্বর্তী সময়ে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে উল্লিখিত বইয়ে (পৃ: ২৮৩-৮৫) বলা হয়েছে—"সারা বিশ্বে আদর্শ সমাজতন্ত্রের একচ্ছত্র প্রভাবের আশা না দেখে তিনি রাষ্ট্রসংঘের (UNO) অধীনে ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সহাবস্থান নীতির যৌক্তিকতা দর্শিয়েছেন।...অন্যদিকে ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীন দেশগুলির গতিরোধ করছে। এই অবস্থায় বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা অকার্যকর। এমতাবস্থায় পরস্পর বিরোধী দেশগুলিকে মানবতার কল্যাণে যতদূর সম্ভব

ঐক্যবদ্ধ রাখাই মঙ্গল। ক্রমে তা থেকেই একদিন প্রগতিশীল অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার বীজ উপ্ত হয়ে ব্যক্তি মানুষের শুভ প্রবৃত্তি ও সৃষ্টিশক্তিকে পরিপুষ্ট করবে। · উপরন্তু তিনি চেয়েছেন বিশ্বের রূপান্তরের জন্য সর্বজ্ঞ ও বিশ্বচেতনা-সম্পন্ন দিব্য অতি মানসে (Divine Supermind) অবতরণ। সেজন্যে মানুষকে মন অতিক্রম করে অতিমানসের দিকে বিবর্তিত হতে হবে। তখন অতিমানসিক গুণসম্পন্ন একটা জাত বা গোষ্ঠী গড়ে উঠবে। অন্যান্যদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ হবে অনেকটা পশু ও মানুষের পার্থক্যের মত। রূপান্তরিত এই প্রাজ্ঞ মানবগোষ্ঠী দিব্য ইচ্ছা ও মানবিক আকুতির তাগিদে নিশ্চল বিবর্তনের সংকট মোচন করবে।"

শ্রী অরবিন্দের এই চিন্তার সাথে স্বামীজীর মৌল পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, স্বামীজী কখনও বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা করেননি। প্রতিটি দেশে জনসাধারণের হাতে প্রকৃত শাসনভার যাবার পথ তিনি দেখিয়েছেন। এইভাবে রূপান্তরিত সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি দেশ বা রাষ্ট্রই নিজস্ব পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাক সুন্দরতর সমাজ গড়ে তোলার জন্য।[৪] তিনি জানতেন, মানুষ সব সময়ই চাইবে সুন্দর, আরও সুন্দর সমাজ তৈরী করতে। এই পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ রাখার জন্যই তিনি বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনি সাম্য চাইতেন, কিন্তু বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে একত্বের স্টীম-রোলার চাইতেন না। দ্বিতীয়ত, ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সহাবস্থান তিনি কখনও চাননি। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, "যাহাতে অপরের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে-বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে-সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে তাহা অকল্যাণকর, এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয় তাহাই করা উচিত।"[৫] অতএব দেখা যাচ্ছে, ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সহাবস্থান না মেনে এই দুটি ব্যবস্থার অকল্যাণকর দিকগুলি ধ্বংস করতে স্বামীজী উৎসাহ দিচ্ছেন। তৃতীয়ত, স্বামীজী আধ্যাত্মিকতাকে প্রধান স্থানে বসালেও আধ্যাত্মিকতার নামে কোনও বিমূর্ত মতবাদকে প্রশ্রয় দিতেন না। একদিকে তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটি মতবাদকে তীব্র সমালোচনা করেছেন, কারণ এই সোসাইটির মতে হিমালয়ের অদৃশ্য মহাত্মারা

জগৎ পরিচালনা করেন; অন্যদিকে 'বর্তমান ভারত' বইয়ে রাম, যুধিষ্ঠির ও অশোকের রাজত্বকে সমালোচনা করেছেন[৬] এই বলে যে ঐ ধরণের রাজত্বে প্রজারা স্বায়ত্তশাসন শেখেনা (আগেই বলেছি স্বামীজী চাইতেন স্বশাসন, সুশাসন নয়)। Beware of the man whose God is in heaven— এই ভাবটি স্বামীজীর সব সময়ই ছিল। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে তুলুক। সুদূর ভবিষ্যতে কোন্ ঐশী মানব আসবেন মানবজাতির রক্ষাকল্পে—এই ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি মানুষকে ডাক দিয়েছেন আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হতে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইয়ে স্বামীজী লিখেছেন, "একটা তামাসা দেখ। ইওরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজকর্ম বন্ধ কর, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দুই-চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর [শ্রীকৃষ্ণ] বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা সমঝ্লি রাম' হল; ওরা ইওরোপীয় যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহা রজোগুণে, মহাকার্যশীল, মহা উৎসাহে দেশ-দেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর আমরা কোণে বসে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি ·। গীতার উপদেশ শুনলে কে? না—ইওরোপীয়। আর যীশুখৃষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কার্য করছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা!! বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ; যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্বনাশ!!! তারপর ভাগ্যফলে ইওরোপীয়গুলো প্রটেস্টান্ট হয়ে যীশুর ধর্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।'[৭] ধর্মের নামে গুপ্ত রহস্যবাদকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বললেন 'আমার সমর নীতি' বক্তৃতায়—"সাহসী হও, সাহসী হও। এই চাই আমাদের। আমাদের প্রয়োজন—রক্তের তেজ, স্নায়ুর শক্তি, লোহার পেশী, ইস্পাতের মন—কোনও কেঁচো-মার্কা ভাব নয়। ঐসব কাঁদা-গলা ভাবকে দূর করে দাও, খেদিয়ে দাও গুপ্ত রহস্যকে। ধর্মে কোনো গুপ্ত ভাব নেই। প্রাচীন ঋষিরা ধর্মপ্রচারের জন্য কোন গুপ্ত সমিতি গড়েছিলেন? জগৎকে তাঁদের মহান সত্য দেবার জন্য কি তাঁদের হাত-সাফাইয়ের কায়দা দেখাতে হয়েছিল?…গুপ্তভাব নিয়ে মাতামাতি, আর কুসংস্কার, সব সময়ই

দুর্বলতার চিহ্ন। তাই সাবধান! শক্তিশালী হও, নিজের পায়ে দাঁড়াও।… একদম কুসংস্কারের পেছনে ছুটবে না। তার চেয়ে যদি ভাহা নাস্তিক হও তাতেও তোমার মঙ্গল, তোমার জাতির মঙ্গল, কারণ সেক্ষেত্রে শক্তি আসবে। আর উল্টোদিকে এইসব কুসংস্কারের ফল পতন ও মৃত্যু ছাড়া কিছু নয়। ধিক্! পৃথিবীর সবচেয়ে ওঁচা কুসংস্কারের ব্যাখ্যার জন্য রূপক সন্ধানে সমস্ত সময় ব্যয় করবে মানুষ—মানব সমাজের পক্ষে এর থেকে লজ্জার বিষয় কি থাকতে পারে?" অন্যত্র তিনি লিখেছেন—"আজ হাজার বছর ধরে আমরা কতই হরি-হরি বলে ডাকছি, তা তিনি শুনছেনই না। আহম্মকের কথা মানুষেই শোনে না তা ভগবান!"

বিকেন্দ্রায়িত শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে স্বামীজী ও গান্ধীজীর লক্ষ্য অনেকটা এক হলেও বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিশেষত, গান্ধীজীর অছিবাদ বিবেকানন্দ-বিরোধী মতবাদ। গান্ধীজী বলেছিলেন, "কৃষক সম্প্রদায়ের এ ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, সমস্ত জমির মালিকানা একান্তভাবে তাদেরই, জমিদারের কোন অধিকার নেই। উভয় সম্প্রদায়েরই নিজেদের এক বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত বলে মনে করা উচিত। এই পরিবারে কর্তা জমিদার।" (সর্বোদয়—অনুবাদক অমলেন্দু দাশগুপ্ত, পৃঃ ৬৩) এ-প্রসঙ্গে স্বামীজী কিন্তু বলেছিলেন, "কোন লোক জোর করে একজনের বিষয় কেড়ে নিয়েছে। এখন বঞ্চিত ব্যক্তি যখন তার বিষয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে তখন প্রথম ব্যক্তি নাকীসুরে চীৎকার শুরু করলো আর মানুষের অধিকার রূপ মতবাদ যে কত পবিত্র তা প্রচার করতে লাগলো।"[৮] বৈপ্লবিক পথ নিয়ে গান্ধীজী কেবল অহিংসাকেই মানতেন। স্বামীজীর মত ছিল, ক্ষমা শক্তিমানের ভূষণ, দুর্বলের ক্ষমা চালাকী, ভণ্ডামী। স্বামীজীর ভাষায়—"দরিদ্রগণ যখন ধনীগণের দ্বারা পদদলিত হয় তখন শক্তিই দরিদ্রের একমাত্র ঔষধ।"[৯] রক্তাক্ত সংগ্রামকে তিনি অবশ্যম্ভাবী মনে করলেও অবশ্য অনিবার্য বলে মানেননি। অভিজাত শ্রেণী নিজের চিতা নিজেই তৈরী করুক এবং দরিদ্রদের সাহায্যে এগিয়ে যাক, নয়তো রক্তাক্ত সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী—এই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। যন্ত্রশিল্পের প্রতি গান্ধীজী ততটা আগ্রহী না থাকলেও স্বামীজী বৈজ্ঞানিক কারিগরীকে মুক্ত কণ্ঠে আহ্বান করেছিলেন। গান্ধীজীর অহিংস-নীতি উন্নত দেশগুলির পক্ষে সুপ্রযুক্ত হলেও আফ্রিকা, লাতিন

আমেরিকা ও এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির পক্ষে কতটা উপযোগী তা নিয়ে সন্দেহ আছে। স্বামীজী এ-বিষয়ে দেশোপযোগী ও কালোপযোগী পন্থায় বিশ্বাসী। দানবীয় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে তিনি অহিংস পথের ওপর ততটা জোর দিতে পারেননি। স্বামীজীর ভাষায়—"বণিকের রাজত্বে গরীবের ভিক্ষাপাত্রের কোনো দাম নেই।"[১০] গান্ধীজী যদিও বিকেন্দ্রায়িত শাসনব্যবস্থার কথা বলে গেছেন, তবুও তিনি নিজে এই ব্যবস্থায় কতটা বিশ্বাসী ছিলেন বলা কঠিন। হরিপুরা কংগ্রেসে নেতাজীর প্রতি তাঁর ব্যবহার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যান্য ঘটনায় তাঁর কথা ছিল শেষ কথা। বস্তুত স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসে যে ব্যক্তিপূজার প্রবণতা দেখা যায় এ-জন্য গান্ধীজী নিজে কম দায়ী নন। বিপরীত দিকে স্বামীজী ছিলেন গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর তিনি মাত্র তিন বছর এর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। মিশন রেজিষ্টার্ড হবার আগেই তিনি নেতার পদ ছেড়ে দেন এবং ভোটের মাধ্যমে নেতা ও কর্মীসচিব নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অনেকেই জানেন না যে শেষ দুই বছর স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নেতার পদ দূরের কথা, ট্রাষ্টিও ছিলেন না। তাঁর গুরুভাইয়েরা তাঁর কাছে নির্দেশ প্রার্থনা করলে তিনি বলতেন: নিজে চিন্তা করে কাজ করো, স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াও। "তোমাদের নতুন নতুন মৌলিক ভাব ভাববার চেষ্টা করতে হবে —তা না হলে আমি মরে গেলেই পুরো কাজটা চুরমার হয়ে যাবে।"[১১] "আমাদের প্রত্যেককে মৌলিক হতে হবে, নয়তো কিছুই হবে না।"[১২] "মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতে বর্তমান হীনাবস্থার কারণ।"[১৩] গান্ধীজীর রাষ্ট্র চিন্তা সম্বন্ধে বলা যায়, তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মূলত ভারতের প্রতি। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে, বিশেষত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে কি ধরণের শাসনব্যবস্থা হওয়া উচিত সে বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ দেননি।

শ্রীঅরবিন্দ বা গান্ধীজীর চেয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিপ্লবচিন্তা ও রাষ্ট্রনৈতিক অবদান অনেক মূল্যবান। যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং ইতিহাস চেতনার দিক দিয়ে শ্রীরায় উক্ত দুজনের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখে অবাক হই যে স্বামী বিবেকানন্দের বহু চিন্তার অনুরণন শ্রীরায়ের মধ্যে রয়েছে। স্বামীজীর বিকেন্দ্রায়িত শাসন, দেশ শাসনে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, নিষ্কাম কর্ম, মুক্তির ইচ্ছেই মানব মনের

গভীরতম আকুতি, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়, বস্তু ও অর্থনীতির বদলে মানব মনকেই শ্রেষ্ঠ আসনে বসানো, ইত্যাদি বহু চিন্তার সাথে শ্রীরায়ের অদ্ভুত মিল দেখা যায়। এমন কি নাস্তিক হয়েও শ্রীরায় লিখেছিলেন, "স্বামীজীর (অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের) ঈশ্বরকে যুক্তির বিচারে পাওয়া যেত, ধর্ম ছিল তাঁর কাছে প্রগতিমূলক, সামাজিক ও মানবিক প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী।" (মানবেন্দ্রনাথ : জীবন ও দর্শন—স্বদেশরঞ্জন দাস, পৃঃ ৫৮৩)। উভয়ের মধ্যে প্রভূত মিল দেখেই মানবেন্দ্রনাথ জীবনীকার শ্রীদাস শ্রীরায়কে স্বামীজীর উত্তরসাধক বলে বর্ণনা করেছেন। উল্লিখিত বইয়ের একটি পরিচ্ছেদের শিরোণাম 'বঙ্কিম-বিবেকানন্দের উত্তরসাধক রায়।'

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রকল্পে মানুষ যুক্তিশীল জীব। এই যুক্তিশীলতার বিকাশে মুক্তির আকাঙ্খা পূর্ণভাবে মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে এবং এভাবেই সে মুক্ত হয়। শ্রীরায়ের এই সিদ্ধান্ত যৌক্তিক দিক দিয়ে ঠিক হলেও কিভাবে মানুষ যুক্তিশীলতার ওপর তার জীবন গড়ে তুলতে পারে, অথবা কিভাবে সে তার অবচেতন মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে, সে-কথা তাঁর মতবাদে নেই। ফলে তাঁর মানবতাবাদের প্রধান ভিত্তি বিমূর্ত ভাবে পরিণত হয়েছে। স্বামীজী দেখিয়েছিলেন, মানুষের চেতন মন যুক্তিকে আশ্রয় করে চলতে চাইলেও তার অবচেতন মনের আবেগ (impulses) ও সংস্কার (instincts) সে পথে বাধা দিচ্ছে। মানুষ যতক্ষণ না এই অবচেতন মনের আবেগ ও সংস্কারের ওপর চেতন মনের প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারছে, ততক্ষণ তাকে চেতন-অবচেতনের টানা-পোড়েনে ব্যতিব্যস্ত হতে হবেই। তাই স্বামীজীর মতে, মানুষকে যুক্তিশীল হবার সাথে সাথে অবচেতন মনকে জয় করার জন্য ধ্যান ও নিষ্কাম কর্মের অভ্যাস করতে হবেই। দ্বিতীয়ত, শ্রীরায় বলেছেন যে নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে সমাজকে সুন্দর করে তুলুক। এখানেও বিমূর্ত মানবতাবাদ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। মানুষ মানুষকে সাহায্য করবে কেন ? সবাই মিলে ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু এই নীতিবাদ চিন্তার দিক থেকে গভীর নয়। পশুযূথের একটি পশু যে কারণে অন্য পশুকে আক্রমণ করে না কিংবা রাশিয়া-আমেরিকা যে-কারণে বিশ্বযুদ্ধে আর জড়িয়ে পড়তে চায় না, মানুষ কি সে কারণেই নীতিবাদী

হবে? অথবা, মানুষ কেবল ভালর জন্যই ভাল হবে যা প্লেটোনিক প্রেমেরই (Platonic love) রকমফের? নীতিবাদের এই ধারণা বিমূর্ত। স্বামীজী এই সমস্যার সমাধান করেছেন তার ইতিহাস ও বিজ্ঞান চেতনার সাহায্যে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে স্বামীজীর মতে জড়ের ওপর চেতনার ক্রমাধিপত্যই সভ্যতার ইতিহাস। এই জড়ের দুটি রূপ—বহিঃপ্রকৃতি (external nature) এবং অন্তঃপ্রকৃতি (internal nature ; Mind)। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করছে এবং আধ্যাত্মিকতার সাহায্যে অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করছে। অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করার অর্থ নিজের অবচেতন মনের ক্ষতিকর আবেগ ও প্রকৃতিকে জয় করা। এই ক্ষতিকর বা অশুভ আবেগ ও প্রবৃত্তি মানুষকে ভীতু ও স্বার্থপর করে রাখে। মানুষ যখন অন্যের উপকার বা সাহায্য করে তখন তার ঐ কাজের মধ্য দিয়ে তার স্বার্থপরতা একটু-একটু করে কমতে থাকে, যার অর্থ সে তার অবচেতন মনের ওপর আধিপত্য লাভ করতে থাকে। তাই স্বামীজী বলেছেন—"পরের উপকার করার অর্থ নিজেরই উপকার করা।"[১৪] 'কর্মযোগ' বইটিতে তিনি তাঁর এই মত আলোচনা করে নীতিবাদকে মূর্ত ও যৌক্তিক করে তুলেছেন। এ-প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। তৃতীয়ত, শ্রীরায় জাতীয়তাবাদকে সমালোচনা করে আন্তর্জাতিকতাবাদকে মুখ্য করে তুলেছেন।

একজন উদারনৈতিক হিসেবে তিনি এ-কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু এর বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। স্বামীজী সাম্যের ওপর জোর দিলেও একত্ব সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন, কারণ তাঁর মতে বৈচিত্র্যই প্রাণের লক্ষণ। স্বামীজীর মতে, কোনো দেশের সংস্কৃতি তার রূপের দিক দিয়ে জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরুক এবং বিষয়গত দিক থেকে আন্তর্জাতিক হোক (national in form and international in content)। বিশ্ব-সংস্কৃতি যেন এক বিশাল ঐকতান এবং জাতীয় সংস্কৃতিগুলি এক-একটি বাদ্যযন্ত্র। প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রের নিজস্ব সুর বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ঐকতানের সময় সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হয় সামগ্রিক সুরলহরীর দিকে লক্ষ্য রেখে। এইভাবেই স্বামীজী আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে জাতীয়তাবাদের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। চতুর্থত, ১৯৪৮ সালে শ্রীরায় র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'র অবলুপ্তি ঘটিয়ে র‍্যাডিকাল

হিউম্যানিস্ট মুভমেণ্ট গড়ে তুললেও এই আন্দোলন খুব শিগগিরই নিশ্চল হয়ে পড়ল। এর কারণ সম্পর্কে শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস লিখেছেন, "নব-মানবতাবাদের দর্শন এতই অভিনব যে তা উপলব্ধি করা র‍্যাডিকাল পার্টির সভ্যদের পক্ষে খুবই দুরূহ হয়ে উঠল।...পার্টির উচ্চ পর্যায়ের কর্মীরা... জাতীয়তাবাদী বিপ্লব বা মার্কসবাদী বিপ্লবের নীতি-পদ্ধতির দ্বারাই প্রভাবিত [ছিলেন]। সুতরাং নব-মানবতাবাদ তাদের পুরাতন শিক্ষা ও সংস্কারের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানল। এই আঘাতের প্রচণ্ডতার ফলে তারা সকলেই অসাড় হয়ে গেল—নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।" (ঐ, পৃঃ ৫৬২-৬৫) "রায়ের দর্শন সেদিন সম্যকভাবে উপলব্ধি না করেও এঁরা (র‍্যাডিকাল সদস্যরা) কেবল রায়ের ব্যক্তিত্বের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাশীলতার জন্য নিজেদের রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দিলেন" (ঐ, পৃঃ ৫৬৮)। ভাবতে অবাক লাগে, অনুগামীরা শ্রীরায়ের দর্শন না বুঝেও সেটিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন কেবল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য! অর্থাৎ, ব্যক্তি মানুষের যে চিত্তমুক্তির স্বপ্ন শ্রীরায় দেখতেন তা তিনি তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেননি। আসলে গান্ধীজীর মতো শ্রীরায়ও নেতৃত্বকে নিজের অধীনে রেখে দিয়েছিলেন, স্বামীজীর মতো নেতৃপদ ছেড়ে দিয়ে নতুন নেতা গড়ে তুলতে পারেননি।

তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে মিলন ঘটাবার যে প্রতিভা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মধ্যে তা ছিল না। বেদান্তের তাত্ত্বিক দিকটিকে ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছিলেন স্বামীজী ; স্পষ্টভাষায় তিনি বলেছিলেন, "সমাজের জন্য যখন নিজের সব ভোগেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন তুমিই ত বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে। কিন্তু সে ঢের দূর!..একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবেই সমাজের জন্য ত্যাগের কথা বলা উচিত, তার আগে নয়।"[১৫] অনুগামীদের দিয়ে নানান ত্রাণকার্য, অনাথ আশ্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রচার-সংগঠন ইত্যাদি স্থাপনা করিয়ে স্বামীজী তাঁর তত্ত্বকে শুধু যে ব্যবহারিক করে তুলেছিলেন তা নয়, গড়ে তুলেছিলেন পরবর্তী পর্যায়ের নেতৃত্ব। রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নেতৃত্ব সম্পর্কিত একটি অমূল্য কথা তিনি লিখেছিলেন একটি চিঠিতে : আমাদের জাতির একটি বড় দোষ যে আমরা ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই এবং আমাদের পরে কি হবে তা কখনও চিন্তা করিনা। মানবেন্দ্রনাথ যে এ-

ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছিলেন তা কি শুধুই তাঁর ব্যবহারিক পরিচালনার ক্ষেত্রে গলদের জন্য, অথবা তাঁর তত্ত্বেই কিছুটা অপূর্ণতা ছিল? তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় মেক্সিকো ও অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রে। প্রকৃতপক্ষে ত্রুটি ছিল তাঁর তত্ত্বে। তাঁর মতবাদ চিন্তার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত হলেও কতগুলি সিদ্ধান্তে তিনি ভুল করেছিলেন, যার ফলে তাঁর নব-মানবতাবাদ বিমূর্ত মতবাদে পরিণত হয়েছিল। মনোবিজ্ঞান (psychology) সম্পর্কে তাঁর অগভীর জ্ঞান-ই ছিল এর মূলে। নব-মানবতাবাদের প্রথম সূত্রটিতে তিনি লিখেছিলেন, "ব্যষ্টি যখন সমষ্টিতে মেশে তখন ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব ঘুচে গিয়ে একটি নতুন সমষ্টি সত্তার জন্ম ঘটে না, ব্যষ্টি ব্যষ্টিই থেকে যায়।...মানব সমষ্টির যে কোন রূপের উপর—যেমন জাতি, শ্রেণী, গোষ্ঠী প্রভৃতিতে প্রাণ ও নার্ভতন্ত্র বিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়ানুভূতিক্ষম এক চিন্ময় সত্তা আরোপ করা ভুল।" শ্রীরায় যত সহজে এ-কথা বলেছেন, বিষয়টি তত সোজা নয়। মব-সাইকোলজী (mob-psychology), জাতীয় বৈশিষ্ট্য (national characteristics)—এগুলি বাস্তব সত্য। স্বামীজী দেখিয়েছেন, মানুষের বৈক্তিক (individual) এবং সামাজিক (social) দুই রূপই আছে। এ-সব কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। স্বামীজীর মতে, মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে তিনটি বাধা দাঁড়িয়ে আছে—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, এবং আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক বাধা হল মানুষের স্বীয় অন্তরের বাধা। তার অবচেতন মনের আবেগ ও সংস্কার তাকে যে বাধা দিচ্ছে, মনকে প্রভাবিত করছে, তাকে দূর করতে হবে ধ্যান, নৈতিকতা, যুক্তিপ্রবণতা ও নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে মানুষের সৃজনী এষণাকে (creative urge) উন্নত করে। মানুষ মূলত ব্রহ্ম, অসীম শক্তির আধার—আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সে এটি উপলব্ধি করতে পারে। আধিভৌতিক বাধা হল বাহ্যপ্রকৃতির বাধা। বিজ্ঞানের সাহায্যে জড়ের ওপর চেতনার আধিপত্য বিস্তার করে এই বাধা জয় করতে হয়। আধিদৈবিক বাধা হলো সমাজ, পরিবেশ, এবং নানান প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার দরুণ বাধা। স্বামীজী বলেছেন, এই তিনটি বাধাকে জয় করাই হল বিপ্লবী কর্মসূচী। আধ্যাত্মিক বাধা দূর করা চাই প্রথমে। আধ্যাত্মিক বাধাকে জয় না করে অন্য দুটিকে জয় করতে গেলে মানুষের অবস্থা হবে পোলট্রি-ফার্মের মুরগীর মতো। পোলট্রির সব ব্যবস্থাই বৈজ্ঞানিক—আলো জেলে ঘর গরম

করা, খাওয়ার ব্যবস্থা, ডিম পাড়ার জায়গা, অসুখে ইঞ্জেকশন দেওয়া, মুরগীর বাচ্চাকে গ্লুকোজ-জল খাওয়ানো, ইত্যাদি ইত্যাদি। সব রকম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পোলট্রির মুরগীগুলির চেতনায় বিজ্ঞানের সঞ্চার হয় না! সেজন্যই স্বামীজী বলেছেন: সবার আগে চাই মানুষ গড়া। আধিদৈবিক সব ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান মানুষেরই তৈরী, এগুলির পরিকল্পনা যতই নিখুঁত হোক না কেন, এগুলির পরিচালনা নির্ভর করছে মানুষেরই ওপর। অতএব আদর্শ মানুষ তৈরী না হলে সব ব্যবস্থা, সব প্রতিষ্ঠানই ভেঙে পড়ে। স্বামীজীর বিপ্লবচিন্তায় এজন্যই মানুষ গড়ার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। মানুষ যতদিন স্থূলদেহ আর পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর ভিত্তি করে সমাজ গড়তে চায়, ততদিন সেই সমাজের ধ্বংসের বীজ থাকে তার মনের মধ্যেই, স্বাভাবিক ছয় রিপুর অন্তরালে। নিজের মনের ওপর মানুষ যতক্ষণ না তার বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখছে, ততক্ষণ কাম-ক্রোধ-লোভ মোহ-অহংকার-ঈর্ষার আকর্ষণে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকেই।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিপ্লবের পথ

বিকল্প পথ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "সংবিধানে কতগুলি আইন তৈরী করলে বা সংসদে কতগুলি বিল পাশ করলেই একটা জাতি গড়ে ওঠে না। মানুষ যতদিন না গড়ে উঠছে ততদিন সমাজবিপ্লবের অন্য কোনও যাদুদণ্ড তৈরী হয় না।"[১] দেশে বিপ্লব এলেই অবস্থাটা পালটে যাবে এমন কোন কথা নেই। ওয়াশিংটন, লেনিন, কামাল পাশার বদলে নায়ক হিসাবে আবির্ভূত হতে পারেন হিটলার, খোমেনি, কিংবা পলপট। অতএব বিপ্লবের নামে ক্ষমতা দখলই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে স্বর্গের সিংহদ্বারে পৌঁছে যাবেই এমন কোনো স্থির প্রত্যয়ে অটল থাকা যুক্তিসিদ্ধ নয়। যারা বলেন সমাজের আমূল রূপান্তর না ঘটলে কোন গঠনমূলক কর্মসূচীর প্রণয়ন সম্ভব নয়, তারা সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েই একথা বলেন। তারা এ-কথা ভেবে-চিন্তে বলেন তা নয়, আসলে অবচেতন মনের মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিকতায় তারা মোহাবিষ্ট। তারা ভাবেন, জোর খাটিয়ে উদ্যত দণ্ডের ভয় দেখিয়ে সব মানুষকে নির্দিষ্ট একটি পথে চালানো সম্ভব। হয়তো তা কিছু পরিমাণে সম্ভব। কিন্তু আখেরে তা শুভ ফল দেয় না। একনায়কতন্ত্র (তা সে যে কোন রূপেই হোক না কেন) একবার চেপে বসলে আর যেতে চায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে এর উদাহরণ প্রচুর।

অতএব নতুন সমাজের ঋত্বিকদের কাজ শুরু করতে হবে সম্পূর্ণ নতুন পথে, আর পাঁচটি রাজনৈতিক দলের পথে নয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দিতে হবে—এটাই হবে তাদের উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যের উপায় হলো জনগণকে নতুন চেতনায় সঞ্জীবিত করে তোলা। বিপ্লবীরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, বরং জনসাধারণকে তারা এই কথাটাই বোঝাবেন যে মানুষ তৈরি না হলে সমাজ-বিপ্লব সঠিকভাবে হতে পারে না। একজন ইন্দিরা, একজন মোরারজী, একজন নাম্বুদ্রিপাদ বা একজন চন্দ্রশেখরকে দিয়ে দেশের সমস্যা মিটবে না;

চাই জনসাধারণের জাগরণ, গণ-চেতনার উদ্বোধন। গ্রামবাসীদের পাশে থেকে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে, গ্রামের রাস্তা-পুকুর-স্কুল ইত্যাদি তৈরী করতে তাদের উৎসাহিত করতে হবে, ব্যক্তিস্বার্থের বদলে যৌথস্বার্থের প্রয়োজনীয়তাব কথা তাদেরই বোঝাতে হবে। অফিস-কর্মী, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র সকলের কাছেই এই কথা তুলে ধরতে হবে যে নিজস্ব দাবীতে মুখর হয়ে শেষ পর্যন্ত কোনও লাভ হয় না যদি দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রতি নজর না থাকে। স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের উদ্দীপ্ত করতে হবে চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে আসতে। ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে তুলে ধরতে হবে আদর্শের সঠিক রূপটি।

প্রশ্ন হবে, শুধু বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়েই ক্ষান্ত হব? না। সেই সাথে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হতে হবে। ক্ষমতা দখল যখন উদ্দেশ্য নয় তখন কারোর সাথে আপোষের প্রশ্ন উঠবে না। মানুষের ন্যায্য দাবী ও সংগ্রামের শরিক হতে হবে বিপ্লবীদেব, এবং সেই সাথে অসংখ্য ছোট ছোট স্টাডি-সার্কেল বা পাঠচক্রের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করতে হবে মানুষদের মৌলিক চিন্তাও স্বাধীন কর্মে উৎসাহিত করতে হবে। সমাজের যে কোনও অন্যায় সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করতে হবে, কার্যকরী পন্থা নিতে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বাজারের চালু রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়, ভোট নষ্ট হয় এমন কোন কাজ তারা করবে না। পুলিশের ঘুষ খাওয়া, সরকারী অফিসে কর্মশৈথিল্য, প্রাইভেট টিউশানীর নামে শিক্ষকদের কালো টাকা উপার্জন, মুসলমানদের বিবাহ ও বিচ্ছেদ সম্পর্কিত আইনের বিরুদ্ধে এই দলগুলি আন্দোলন করতে ভয় পায়, কারণ তারা মনে করে এই কাজ করলে নির্বাচনে তারা ভোট কম পাবে, এবং যেহেতু ক্ষমতা দখলই এদের মূল উদ্দেশ্য, সেজন্য এরা স্বীয় স্বার্থে সামাজিক অন্যায ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে অনিচ্ছুক। এইসব ভদ্রলোক নেতা যারা আগে অনমনীয় সমাজবিন্যাসের কৌলিন্য ভাঙ্গিয়ে নেতৃত্ব করতেন, স্বাধীন ভারতে রাজনীতিকরণ সক্রিয় হবার পর থেকেই তাদের নেতৃত্বস্থিতি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কারণ গণতন্ত্রে সমর্থক সংখ্যা সংগঠিত করার ক্ষমতা নেতৃত্বলাভের অন্যতম শর্ত এবং বর্তমানে সক্রিয় জনগোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিছুটা ভূমিকা রয়েছে। এইভাবে এই তথাকথিত নেতা ও দলগুলি সব

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় না, হতে পারে না। তাই বিবেকানন্দ-অনুসারী বিপ্লবীদের সামনে এক বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জনগণের চেতনায় বিপ্লব আনতে হবে।

কাজটি সময়সাপেক্ষ। তা ঠিক। শর্টকাট বিপ্লব তো অনেক দেখা গেল। এবারে না হয় নতুন পথটিই পরীক্ষা করে দেখা যাক। পাশ্চাত্যের সংসদীয় গণতন্ত্র এবং মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের বিকল্প নতুন রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। ভারতের জনসাধারণ ইতিমধ্যেই প্রচলিত রাজনৈতিক মতগুলিতে এবং নেতাদের ওপর আস্থা হারিয়েছে, কিন্তু বিকল্প কোনো মত ও পথের অভাবে অনাস্থা সত্বেও তারা কোন-না-কোন দলকে সমর্থন করছে। নতুন বিকল্প পথ যদি তাদের কাছে উপস্থিত করা যায়, তবে তাদের মনে আশার সঞ্চার হবে এবং তারা এগিয়ে আসবে এই মতকে বাস্তবে রূপ দিতে। স্বামীজী যে বিপ্লবের কথা বলে গেছেন, কতগুলি মৌল নীতি দিয়ে গেছেন, সেগুলি তুলে ধরতে হবে। আদর্শের রূপ ও ব্যবহারিক প্রয়োগের বিভিন্ন দিক জনগণের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। তবে এ যেন অনড় কোনো শাশ্বত বিধান না হয়। মানুষেরা একে নিয়ে আলোচনা করুক, তার প্রয়োগ কুশলতা নিয়ে পরীক্ষা করুক ; প্রয়োজন হলে নতুন মৌল চিন্তায় একে প্রোজ্জ্বল করে তুলুক। মনে রাখতে হবে, বিপ্লব কোনো পূজা নয়, এক ধারাবাহিক বিবর্তন।

তাত্ত্বিক সংগ্রাম

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান ভাবাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংগ্রামী যুবকদের জানতে হবে ভারতের ইতিহাস ও বিশ্ব-ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে স্বামীজীর বক্তব্য। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পণ্ডিতদের একমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সমাজবিজ্ঞান ও মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সরকার নিয়োজিত পণ্ডিতদের সমাজবিজ্ঞানের অন্ধ অনুসরণ থেকে নিবৃত্ত হয়ে বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃত রূপ বুঝতে হবে এবং মৌলিক চিন্তা ও বাস্তব ঘটনাবলীর মাধ্যমে এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারাকে অনুধাবন করা দরকার, তাদের ব্যক্তিজীবনের ও সমাজজীবনের জটিল

বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে সমস্যার উৎস খুঁজে বের করতে এবং তার সমাধানের জন্য স্বামীজীর মননালোকে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনা করে সমাধানটি তুলে ধরতে হবে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে। প্রচলিত নানারকম মতবাদের পাশাপাশি স্বামীজীর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা পর্যালোচনা করে প্রস্তুত হতে হবে সমাজের আমূল রূপান্তরের জন্য। বিরোধী নানান মতাদর্শগুলিকে বিশ্লেষণ করে বিতর্ক চালানোর জন্য নিজেকে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করা দরকার। কতকগুলি সূত্রের মধ্য দিয়ে ভাবাদর্শগত সংগ্রামকে এভাবে প্রকাশ করা যায় :

(১) বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শ, এবং কর্মকৌশল সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকা ; (২) সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে স্বামীজীর চিন্তাধারা তুলে ধরা ; (৩) পাঠচক্র এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিবেকানন্দ-চর্চার বিস্তৃতি ঘটানো ; (৪) বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত ভাবধারা প্রচারের প্রয়োগ-কৌশল আয়ত্ত করা ; (৫) নানান স্তরের লোকদের ঐক্যবদ্ধ করে যৌথ মানসিক আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস ; (৬) গণসংগঠন, গণশিক্ষা ও গণচেতনার বিস্তৃতি ঘটানো।

'আমার সমরনীতি' বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন, "যে নতুন শক্তিতে, যে নতুন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নতুন ব্যবস্থার প্রণয়ন হবে, সেই লোকশক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন কর। সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথম কর্তব্য—লোকশিক্ষা।"[২]

আজকের সমাজে, বিশেষত যুবমানসে, স্বামীজী সম্বন্ধে যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে তা একটি শুভ লক্ষণ। এই দীপশিখাকে রক্ষা করতে হবে সমগ্র শক্তি দিয়ে। মনে রাখতে হবে, বহতা নদীর মতো সামাজিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, নয়তো অশুভ শক্তি প্রবল হয়ে উঠবে। স্বামীজী যে শুধু এক নবদিগন্তের সন্ধানই দিয়ে গেছেন তা নয়, এক মহান দায়িত্বও দিয়ে গেছেন তরুণদের ওপর। স্বামীজীর সেই মহা আহ্বান[৩] আজও অসংখ্য তরুণ-তরুণীকে উদ্দীপ্ত করছে—'জাগো জাগো মহাপ্রাণ। সমস্ত জগৎ যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। তোমার কি এখন ঘুমিয়ে থাকা সাজে? কি হবে ইট কাঠ পাথরের মতো বেঁচে থেকে? যদি জন্মেছিস তো পৃথিবীতে একটা দাগ রেখে যা। আর তাঁর সেই মহামন্ত্র—Arise, Awake, and stop not till

the goal is reached.

যুব বিপ্লবীদের চারটি বিষয়ের কথা মনে রাখতে হবে—বিপ্লবী চরিত্র, গণ চেতনার প্রসার, গণশিক্ষা এবং গণসংগঠন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে—জনসাধারণের অবস্থার প্রভেদে, অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী, এই চারিটি বিষয়ের বাস্তব কার্যকলাপ বিভিন্ন রকমের হতে বাধ্য। কারণ, স্বামীজী নির্দেশিত বিপ্লব শুধু ভারতের জন্যই নয়, এটি সমগ্র বিশ্বের জন্যই প্রয়োজন, অর্থাৎ এটি একটি বিশ্ব বিপ্লব। একে ছড়িয়ে দিতে হবে কেবল ভারতেই নয়, ধনবাদী-মার্কসবাদী-ধর্মীয়-সামরিক সকল দেশেই।

নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ

এবারে প্রশ্ন উঠবে—এই বিপ্লবের যে উদ্দেশ্য সেই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপটি কি হবে? সহজভাবে এর উত্তর দিতে গিয়ে একটা কাহিনী তুলে ধরা যায়:

গ্রামের নাম নিশ্চিন্দিপুর। তার চারপাশে আরও গোটা দশেক গ্রাম। কি অবস্থা ছিল সেখানে এতদিন? গ্রামে একটি প্রাথমিক স্কুল আছে, কিন্তু হাইস্কুল সাত মাইল দূরে। একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে যেখানে ভাল ডাক্তার ও ওষুধ দুইয়েরই অভাব। গ্রামের রাস্তাঘাট সবই কাঁচা, বর্ষাকালে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রামবাসীরা কিন্তু জলের অভাবে কেউ বছরে একটি কেউবা দুটির বেশি ফসল পায় না। ইলেকশনে গ্রামবাসীরা ভোট দেয়। আশ্বাস পায় ভাল স্কুল, পথঘাট, ডিস্পেন্সারী, সেচ ব্যবস্থার। কিন্তু প্রতিবারেই একই অবস্থা—অবস্থার পরিবর্তন হয় না। জগৎ মণ্ডল বা দুখু মিয়াকে প্রশ্ন করুন—গ্রামের চেহারা এমন কেন? ওরা দোষ দেবে ভোটবাবুদের, দায়ী করবে কলকাতার লোকদের। ওদের ধারণা, তাদের গ্রামের উন্নতি করার দায়িত্ব শহরের লোকদের, ওদের দায়িত্ব শুধু ভোট দেওয়া।

এবারে আসুন, নতুন একটা সমাজব্যবস্থার ছবি আঁকা যাক। জগৎ মণ্ডল আর দুখু মিয়া তখনও ভোট দেয়, তবে সেই বাবুরা কলকাতার নন, গ্রামের। আরও দশটা গ্রামের লোকেরা ভোট দেয় নিজেদের লোকদেরই, নির্বাচিত করে অন্য দশেককে। গ্রামের কোথায় নতুন রাস্তা হবে, কোথায় পুকুর কাটতে হবে, সেচের জন্য নতুন পাম্প কিনতে হবে কিনা, গ্রামের

ডিস্পেন্সারীতে আরও পাঁচটা বেঞ্চের দরকার কিনা, স্কুলে পড়াশুনা ঠিকমতো চলেছে কিনা, এরকম সব বিষয়েই সিদ্ধান্ত নেয় গ্রামবাসীরা। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে বুঝিয়ে দেয় নতুন কাজগুলির তদারকী কিভাবে করতে হবে। টাকা আসে কোথা থেকে? কিছুটা দেয় রাজ্য সরকার, বাকীটা গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্য থেকে জোগাড় করে। বাইরে থেকে মজুর আনতে হয় না, গ্রামবাসীরাই শ্রমদান করে। ওদের গ্রামকে ওরাই সুন্দর করে তোলে মমতা দিয়ে, গায়ে-গতরে খেটে।

গ্রামের তাঁতি লক্ষণ রায় একবার প্রস্তাব দিল, তাঁতের কাজ বেড়ে যাচ্ছে বলে যদি একটা স্কুল খোলা যায় গ্রামে যেখানে গ্রামের মেয়েরা গামছা ধুতি বুনতে শিখবে তবে খুব ভাল হয়। গ্রামের সভায় উপস্থিত সব প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের অধিকাংশ একে সমর্থন জানাল। নির্বাচিত দশ প্রতিনিধির অন্ততম রামু মুদী রাজ্যের বিধানসভার সদস্য। সে গ্রামবাসীদের আবেদন তুলল বিধানসভায়। প্লানিং কমিশনের কয়েকজন সদস্য নিশ্চিন্দপুর গ্রামে এসে খোঁজ খবর নিয়ে রিপোর্ট দিল—এ ধরণের স্কুল খুললে গ্রামবাসীরা উপকৃত হবে, তবে এতে যে টাকার দরকার তার ৭৫% রাজ্য সরকার দেবে আর ২৫% গ্রামবাসীরা দেবে; এছাড়া স্কুল-বাড়ি তৈরির জন্ত গ্রামবাসীরা শ্রমদান করবে। গ্রামবাসীরা রাজি হলে পরের বছরই স্কুলটি চালু হল।

অর্জুন প্রামাণিকের খুব ইচ্ছে ছেলেকে ডাক্তারী পড়ায়। গ্রামে একটা মেডিক্যাল কলেজ করা উচিত—সে প্রস্তাব দিল গ্রামসভায়। রাম মুদী বিধানসভায় এই প্রস্তাব তুলতে তাকে অন্যান্য সদস্যরা মিলে বোঝাল, যেসব প্রতিষ্ঠান চালাতে অনেক টাকার দরকার সেগুলি গ্রামে না করে কোনো মফঃস্বল শহরে করাই ভাল; তাহলে চারিদিকের গ্রামগুলির ছেলে-মেয়েরাও সেখানে পড়তে আসবে। নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামসভায় ঠিক হলো, যেহেতু অর্জুন প্রামাণিকের ছেলে খুবই মেধাবী, সেহেতু শহরে তার ডাক্তারী পড়ার খরচ গ্রামসভাই দেবে। সে বড় হয়ে ডাক্তারী পাশ করে নিশ্চিন্দপুরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করবে।

নিশ্চিন্দপুরের গ্রাম-পঞ্চায়েতের খরচ চলে কিভাবে? রাজ্য সরকার কিছু টাকা দেয়, বাকীটা ওঠে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে তাদের আয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ পঞ্চায়েতের কাজের জন্ত দেয়—কেউ

টাকার হিসেবে, কেউ ফসল দিয়ে, কেউ বা নিজের বোনা ধুতি-গামছা বা নিজের তৈরী লাঙল-কোদাল দিয়ে। গ্রামে একটি ছোট সিনেমা হল আছে টিকিট পঞ্চাশ পয়সা করে। সিনেমা-হলটির মালিক গ্রামবাসীরা। প্রতি মাসের উদ্বৃত্ত অর্থ যায় পঞ্চায়েতের কোষাগারে। গ্রামে যে পুকুরগুলি আছে, তার মালিকও গ্রামবাসীরা। পুকুরের উদ্বৃত্ত মাছ বিক্রী করে টাকা পায় গ্রাম-পঞ্চায়েত।

দুখু মিয়া আর জগৎ মণ্ডল আজ আর ভোটবাবু বা কলকাতার লোকদের গালাগালি দেয় না, ওরা জানে যে গ্রামের উন্নতি নির্ভর করছে ওদেরই ওপর। ওদের প্রয়োজন কি তা ওরা বুঝতে শিখেছে, কিভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে তাও জেনেছে। ওরা পরিণত হয়েছে নতুন মানুষে, যে মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তোলে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "লোকগুলিকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের যত ঐশ্বর্য আছে সব ঢাললেও ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামেরও যথার্থ সাহায্য করা যায় না।"[৪] মানুষকে তাই আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে, দায়িত্ব আর কর্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে হবে। তবেই মানুষ মানুষে পরিণত হবে। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, রাষ্ট্রশক্তির ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে।

সেই নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম। ওখানকার নতুন জগতে দুখু মিয়া আর জগৎ মড়ল গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র গঠন করেছে। রাষ্ট্রের মন্ত্রীরা তাদের মতামত নিশ্চিন্দিপুরের লোকদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। ঐ গ্রামের উন্নতির পরিকল্পনা করে গ্রামবাসীরাই। রাষ্ট্র শুধু সাহায্য করে। অর্জুন প্রামাণিকের ছেলে ডাক্তার হতে চেয়েছিল। তার স্বাধীন বিকাশের পথে গ্রামবাসীরা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। সে-ও সমাজের সাহায্যে ডাক্তারী পাশ করে গ্রামেই ফিরে এল সমাজকে সাহায্য করতে। গ্রামের রাম মুদীকে গ্রামবাসীরা ভোট দিয়ে বিধানসভায় পাঠিয়েছিল। তার কাজটা কি? ভোটের আগে তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়নি গ্রামে স্কুল করে দেবে, লোককে চাকরী দেবে, ইত্যাদি। ভোটে দাঁড়িয়েছিল আরও চারজন। জিতল কিন্তু রামু মুদীই। কেন? গ্রামবাসীরা লক্ষ্য করেছিল যে গ্রামের উন্নতিতে লোকটা খাটে খুব। সন্ধ্যেবেলা কয়েকজন চাষী ও

তাঁতীকে অঙ্ক শেখায়, কারোর অসুখ-বিসুখে নিজেই ওষুধ নিয়ে আসে ডাক্তারখানা থেকে। তাছাড়া লোকটি বিনয়ী, ভদ্র, চালাক ও চটপটে। ওর কাজ আর চরিত্রে গ্রামবাসীরা আগে থেকে সন্তুষ্ট ছিল বলেই সে জিতল। বিধানসভার সদস্য হলে হবে কি, রাম মুদীকে চলতে হয় গ্রামসভাগুলির কথা অনুসারে। গ্রামের কি কি সমস্যা সে সব গ্রামসভাগুলিই ওকে বলে দেয়। সেই অনুসারে সে বিধানসভায় কথা বলে। আর তার ফলে কিভাবে কাজ হয় তা আমরা আগেই দেখেছি।

রাম মুদীর কাজকর্মে গ্রামবাসীরা খুব খুশি। মনে হয় সামনের নির্বাচনেও সে জিতবে। একজন লোক দুইটি টার্মের (term) বেশি বিধানসভার সদস্য থাকতে পারে না। পেশাদারী নেতা যাতে গজিয়ে না ওঠে এবং নতুন লোক সুযোগ পায়—এই দুই উদ্দেশ্যেই এ-রকম আইন। কপাল খারাপ ছিল যদু কৈবর্তের। নিশ্চিন্দিপুর থেকে ২৫ মাইল দূরে মুন্সীগঞ্জ। সেখানকার গ্রামগুলির লোকদের ভোটে সে জিতে বিধানসভার সদস্য হয়েছিল। কিন্তু দেমাকে তার মাথা গরম হলো। নিজেকে কেষ্ট-বিষ্টু মনে করে গ্রামবাসীদের তাচ্ছিল্য করতে লাগল। তাছাড়া বেশির ভাগ সময় সে কলকাতাতেই থাকত। মুন্সীগঞ্জের গ্রাম পঞ্চায়েতের কথামতো সে কাজও করত না। শেষে পঞ্চায়েত নালিশ করল রাজ্যসভার কাছে। গ্রামে তদন্ত কমিটি এল। প্রতিটি গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ গ্রামসভাগুলিকে তাদের মতামত জানাল। সব কটা গ্রামসভার মিলিত মতামত গণনা করে গ্রাম-পঞ্চায়েত তার ফলাফল জানাল কমিটিকে। কমিটির সামনেই এই মতামত গ্রহণ চলল। পরে যদু কৈবর্তের সদস্যপদ খারিজ হয়ে গেল।

গ্রাম-পঞ্চায়েতের কাজ খুব বেশি। প্রতি দুই বছরের বাজেট তৈরী করতে হয়। গ্রামসভাগুলি তাদের মত জানায় পঞ্চায়েতকে। সেই মতামতগুলি আলোচনা করে ঠিক হয় কর্মসূচী। একভাগের সম্পূর্ণ খরচ পঞ্চায়েত বহন করে গ্রামসভাগুলির সাহায্যে। অন্য ভাগটির জন্য টাকা আর কাজ কিভাবে হবে তা বুঝিয়ে দেওয়া হয় রাম মুদীকে। সে সেটি নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করে। সরকারের মূল নীতি হল—স্বাবলম্বী হও। গ্রাম-পঞ্চায়েতের কাজে রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করে না। তবে কতগুলি ব্যাপারে বিশেষ নিয়ম আছে। গ্রামবাসীরা তাদের উৎপন্ন ফসল পঞ্চায়েত ছাড়া অন্য

কারোর কাছে বিক্রি করতে পারে না। পঞ্চায়েতও কিছু বিক্রি করতে গেলে রাজ্য সরকার ছাড়া বাইরের অন্য কারোর কাছে বিক্রি করতে পারে না। গ্রামবাসীরা ধান-গম-তরকারি-গামছা-ধুতি-লাঙল পঞ্চায়েতের কাছে বিক্রি করে। পঞ্চায়েতের নিজস্ব বাজার আছে বিভিন্ন গ্রামে। সেখানেই গ্রামবাসীরা জিনিস কেনা-বেচা করে পঞ্চায়েতের কাছে। উদ্বৃত্ত পণ্য পঞ্চায়েত বিক্রী করে দেয় রাজ্য সরকারের কাছে। সরকারের গাড়ি সপ্তাহে ২/৩ দিন এসে পঞ্চায়েতের কাছে জিনিস কেনা-বেচা করে। কৃষি আর কুটির শিল্পের পণ্যের বাজার নিয়ে চাষী-তাঁতীর চিন্তা করতে হয় না, কারণ রাজ্যসরকার সব উদ্বৃত্ত পণ্য কিনে নেয়।

আগের কথায় ফিরে যাই। গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ের পথই সঠিক পথ। শুধু মুখে বিপ্লব-বিপ্লব বলে চেঁচালেই হবে না, বিপ্লবের লক্ষ্য ও পথ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। মানুষের স্বার্থের দোহাই দিয়ে মানুষের গলাটেপা চলবে না। খাওয়া-পরাটা মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। কিন্তু সেই সাথে চিন্তার স্বাধীনতাও দিতে হবে। ১-৮-১৮৯৮ তারিখের একটি চিঠিতে শাসন-পরিচালনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে স্বামীজী লিখেছেন— "মানুষের আগ্রহ না থাকলে কেউ খাটে না, সকলকে দেখানো উচিত যে প্রত্যেকেরই কাজে ও সম্পত্তিতে অংশ আছে এবং কার্যধারা সম্বন্ধে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে. পর্যায়ক্রমে প্রত্যেককেই দায়িত্বপূর্ণ পদ দেবে যাতে সকলেই দৃষ্টি রাখতে ও চালাতে পারে, তবেই কাজের লোক তৈরী হবে আমাদের দেশের প্রধান দোষ আমরা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে পারিনা। এর কারণ হল আমরা অপরের সঙ্গে কখনও দায়িত্ব ভাগ (to share power with other) করতে চাই না, আর আমাদের পরে কি হবে তা কখনও ভাবি না।" সরকারকে হতে হবে সঠিককার্যে জনগণের দ্বারা চালিত। জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করাই সরকারের মূল লক্ষ্য।

বিপ্লবী অনুপ্রেরণা

গ্রামের মানুষের পাশে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে শহরের দিকেও বিপ্লবীদের নজর দেওয়া দরকার। শহরে লোকদের মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়—বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শ্রমিক ও ব্যবসায়ী। প্রথম তিন সম্প্রদায়ের ওপর

বেশি নজর দিতে হবে। গণতান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীদের কাছে টানার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক প্রমুখকে আমন্ত্রণ করতে হবে নানারকম আলোচনা সভায় যেখানে মৌলিক চিন্তার চর্চা চলবে এবং গঠনমূলক পথে এরা কাজে নামবেন। চেষ্টা করতে হবে যাতে সাংবাদিকেরা গঠনমূলক কাজের খবর প্রকাশ ও নির্ভীকভাবে সত্য ঘটনা তুলে ধরেন, সাহিত্যিকেরা সুস্থ সমাজচিন্তার পরিচয় দেন এবং শিক্ষকেরা সপ্তাহে অন্তত তিনঘণ্টা সময় দিতে পারেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বিনাব্যয়ে পড়াতে। গঠনমূলক নানান কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের কাছে টানুন এবং বিপ্লবে সক্রিয় অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করুন। এ-ধরণের গঠনমূলক কাজ ও পাঠচক্রের মাধ্যমে ছাত্রদেরও কাছে টানুন। ছাত্রেরা কাজ চায়। তাই শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও গ্রামবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে এদের উৎসাহিত করুন। শ্রমিকদের মাঝে কাজ করার প্রথম পদক্ষেপ হবে তাদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াস ও উন্নত সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করানো। তাদের বাসস্থানে গিযে এই কাজ করতে হবে। সেই সাথে তুলে ধরতে হবে ভারতের ও বিশ্বের ভূগোল-ইতিহাস। এবং নতুন বিপ্লবের রূপরেখা, এর সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকগুলি তুলে ধরুন। তাদের অনুপ্রাণিত করুন যাতে তারা মাঝে মাঝে শ্রমদানের মাধ্যমে কোনো গঠনমূলক কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়। ব্যবসায়ীদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—একদল যাদের বিবেকবোধ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব সচেতনতা আছে, দ্বিতীয় দল যাদের টাকা রোজগার ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। দ্বিতীয় দলটি বিপ্লবে সাহায্য করবেনা বলে এদের প্রাথমিকভাবে গণনার বাইরে রাখা উচিত। মানুষের বিক্ষোভই এদের পক্ষে একমাত্র ওষুধ। আর প্রথম দলকে অনুপ্রাণিত করুন বিপ্লবে সহযোগী হতে।

শহরে কাজ করার সময় মনে রাখতে হবে আদর্শই প্রধান। বিপ্লবের বিরোধীদের সম্পর্কে আমরা সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করব। একটা কথা শুধু মনে রাখতে হবে—বিপ্লবীরা যেহেতু কোনো স্বার্থ নিয়ে কাজে নামছে না, গদী বা অর্থ যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য নয়, সুতরাং কোনক্রমেই আদর্শকে ছোট করা চলবে না।[১] স্বামীজীর মতে বিপ্লবীদের তিনটি গুণ থাকা দরকার—জনসাধারণের প্রতি ভালবাসা, কার্যকরী পন্থা, আর নির্ভীক প্রয়াস।

মাদ্রাজে 'আমার সমরনীতি' বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "হে ভাবী সংস্কারকেরা, ভাবী স্বদেশ হিতৈষীরা, তোমরা হৃদয়বান হও, তোমরা প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ যে কোটি কোটি লোক অনাহারে মরছে, কোটি কোটি লোক হাজার বছর ধরে আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছে? তোমরা কি মর্মে মর্মে অনুভব করছ যে অশিক্ষার কালো মেঘ ভারতের আকাশ আচ্ছন্ন করে আছে? এই চিন্তা কি তোমাদের অস্থির করে তুলেছে? এই চিন্তায় তোমাদের কি ঘুম বন্ধ হয়ে গেছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সাথে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে? এই চিন্তা কি তোমাদের পাগল করে তুলেছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের ধ্যানের একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছে? ঐ চিন্তায় বিভোর হয়ে তোমরা কি তোমাদের নাম-যশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয় সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলে যেতে পেরেছে? এই অবস্থা তোমাদের হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে তবে জেনো দেশপ্রেমিক হবার প্রথম সোপানে তুমি পা দিতে পেরেছে। ...মানলাম, তোমরা দেশের দুর্দশা প্রাণে অনুভব করছ। কিন্তু প্রশ্ন করি, এই দুর্দশার প্রতিকার করার কোনো উপায় স্থির করেছ কি? কেবল বৃথা বাক্যে শক্তিক্ষয় না করে কোন কার্যকর পথ বের করেছ কি? দেশবাসীকে গালাগালি না দিয়ে তাদের যথার্থ সাহায্য করতে পার?... কিন্তু এতেও হলো না। তোমরা কি পর্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে কাজ করতে প্রস্তুত আছ? যদি সমস্ত জগৎ তরবারি হাতে নিয়ে তোমাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাহলেও যা সত্য বলে বুঝেছ তা করে যেতে পারবে কি? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্রও তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তবুও তোমরা ঐ সত্য পথ ধরে রাখতে পারবে? · নিজের পথ থেকে বিচলিত না হয়ে তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে? এ-রকম দৃঢ়তা কি তোমাদের আছে? যদি এই তিনটি গুণ তোমাদের থাকে তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কর্ম করতে পারবে।"

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম তা থেকে স্বামীজীর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্ট হবে। এটিকে স্পষ্টতর করে বলতে গেলে যা দাঁড়াবে তা হল—এশটাব্লিশমেণ্টের ভিত্তিকেই আঘাত হানা। গত পাঁচ হাজার বছরের মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক এই এশটাব্লিশমেণ্ট। অ্যারিস্টটলের

অভিজাততন্ত্র বা ম্যাকিয়াভেলির রাজতন্ত্র থেকে শুরু করে মার্কসের প্রোলে-তারীয়েৎ ডিকটেরশিপ, সবই আবির্ভূত হয়েছিল শোষণের নিবাকরণের জন্য। কিন্তু আজও যে পৃথিবীর মূল সমস্যার সমাধান হয়নি, তার কারণ সব মতবাদই শেষ পর্যন্ত এশটাব্লিশমেণ্ট গড়ে তুলেছে। বুদ্ধ থেকে মার্কস—মৌল সমস্যা দূরীকরণে চেষ্টা করলেও তাঁদের মতবাদেই এমন এক ত্রুটি রয়ে গেছে যা শেষ পর্যন্ত এস্টাব্লিশমেণ্টকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

ঐক্য আর এস্টাব্লিশমেণ্ট সমর্থক নয়। ঐক্য মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার, মানবসভ্যতার উজ্জ্বল দিক। কিন্তু এই ঐক্য যখন 'একটিমাত্র মতবাদের' সমর্থক হয়ে সকলের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় নিজস্ব দর্শন ও কতৃত্ব তখনই তা এস্টাব্লিশমেণ্টে পরিণত হয়। বৌদ্ধ শ্রমণেরা যখন সবাইকে বলতে বললেন 'সঙ্ঘং শরণম্ গচ্ছামি' তখনই আদর্শের মধ্যে এস্টাব্লিশমেণ্টকে সুযোগ করে দিলেন। অ্যারিস্টটল সমাজের জ্ঞানী-গুণীদের, ম্যাকিয়াভেলি রাজাকে, মার্কস কমিউনিস্ট পার্টিকে যখন সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে চাইলেন তখনই প্রকারান্তরে এস্টাব্লিশমেণ্টকেই আবাহন করলেন। এদিকে লক্ষ্য রেখে স্বামীজী বলেছিলেন[৫] 'জনগণের চোখ খুলে দিতে হবে যাতে তারা জগতে কোথায় কি হচ্ছে তা জানতে পারে। তাহলে তারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই করে নেবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নর-নারী নিজেরাই নিজেদের উদ্ধার করবে। · আমাদের কর্তব্য—কেবল তাদের মাথায় কতগুলি ভাব দিয়ে দেওয়া, বাকি যা কিছু, তারা নিজেরাই করে নেবে।' স্বামীজীর এই উক্তির সমালোচনা করে কোন কোন মার্কসবাদী পণ্ডিত এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে বিবেকানন্দ অত্যন্ত প্রগতিশীল কথাবার্তা বলেও মাঝপথে থেমে গেছেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা বলার সাথে সাথে রাজনৈতিক কর্মসূচীর কথা বলাও তাঁর উচিত ছিল। এই সব পণ্ডিতেরা স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিটিই বুঝতে পারেন নি। স্বামীজী জগতের তথা মানব সভ্যতার কয়েকটি মৌলিক সমস্যার সমাধানকল্পে নিজস্ব বক্তব্য রেখেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে চেতনার জাগরণ ঘটানো; একজন ডিক্টেটরের মতো "এই করো, ঐ করোনা" বলে অদেশ দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের মনের মুক্তি ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। সেই সাথেই তিনি নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন। মার্কসবাদীরা

হেগেলীয়ান ডায়ালেকটিকস স্বীকার করে নিয়েও মার্কসবাদরূপ থিসিসে সমাপ্তি টানতে চান, নতুনতর অ্যান্টি-থিসিসের সুযোগ দিতে চান না, যার ফলে মার্কসবাদ আজ অন্ধ গোঁড়ামীতে পর্যবসিত হযে নতুন এস্টাব্লিশমেণ্টের জন্ম দিয়েছে। স্বামীজীর মৌলিকতা এখানেই যে তিনি জনসাধারণের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতায় বিশ্বাস রেখেছেন এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ('নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের তত্ত্ব' অংশটি দেখুন।) তিনি বলেছিলেন : শাস্ত্রের মর্যাদা আছে ঠিকই, তবে শাস্ত্রকে চিরকাল মাথায় করে রাখার দরকার নেই ; শাস্ত্রের ওপর পা দিয়ে দাঁড়াও, মাথা থাক উন্মুক্ত আকাশে। এই কথার তাৎপর্য—মানুষ বিভিন্ন মতবাদ জানুক ও পড়ুক, কিন্তু কোনও একটি বিশেষ মতবাদে সে যেন আবদ্ধ না হয়ে পড়ে, ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনার পথ যেন রুদ্ধ না হযে পড়ে। এদিকে তাকিয়েই রূপকের ভাষায় তিনি বলেছিলেন : চার্চে (সম্প্রদায়ে) জন্মানো ভাল, কিন্তু মরা ভাল নয়।[৬] সামাজিক শক্তির কেন্দ্রীকরণ, মতান্ধতা, ও এস্টাব্লিশমেণ্ট হাত ধরাধরি করে চলে, এবং পরিণামে শোষণ ও অত্যাচারের জন্ম দেয়। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, দার্শনিক বিভিন্ন মতবাদ যখনই জোর করে ঐক্য চাপাতে চেয়েছে, তখনই সেগুলি এস্টাব্লিশমেণ্টের ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছে। এবং এইসাথে এস্টাব্লিশমেণ্টের প্রয়োজনেই স্বীয় দলের সমর্থকদের অনাচার বিষয়ে চুপ করে থেকেছে। ফলে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ভিসিয়াস সার্কল, যা শেষ পর্যন্ত আক্রমণ করেছে ঐ এস্টাব্লিশমেণ্টকেই। বুদ্ধের নাম নিয়ে সমগ্র এশিয়াকে একই মন্ত্র শেখাতে চেয়েছেন শ্রমণেরা, যীশুখৃষ্টের নাম নিয়ে পাদ্রীরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে মদৎ জুগিয়েছেন, হজরত মহম্মদের বাণী নিয়ে অস্ত্রধারীরা ছড়িয়ে গেছে স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত, গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে বণিকেরা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে, মার্কসীয় আদর্শের নামে রাশিয়া আক্রমণ করেছে চেকোশ্লোভাকিয়াকে, চীন ভিয়েৎ-নামকে, ভিয়েৎনাম কাম্পুচিয়াকে। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজ ও অন্য দেশের জনসাধারণের শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য দিয়েই তৈরি করে বিশাল সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী, গুপ্তচরের নেট ওয়ার্ক, রকেট, মিসাইল, সাবমেরিন, পারমাণবিক বোমাসহ নিত্যনতুন মারণাস্ত্র। গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের দোহাই দিয়েই এই রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে নিজেদের হাতে রেখে দেয়

বৈষম্যমূলক ভেটো-ক্ষমতা। প্রযুক্তিবিদ্যা, বাণিজ্য, অস্ত্রসজ্জা দিয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে নিজস্ব ধরণের বিশ্বরাষ্ট্রকে। অর্থনৈতিক-সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ হয়ে গেছে অনেকটা, অপেক্ষা শুধু রাজনৈতিক স্থপার-স্ট্রাকচারের। দুই শিবির এগিয়ে চলেছে একই উদ্দেশ্যে; হিটলার যে উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেছিলেন, সে একই উদ্দেশ্য আজ বিশ্বের দুই শিবিরের নায়কদের অবচেতন মনে। এই দুই শিবির যদি নিজেদের মধ্যে গোপনে বোঝাপড়া করে নেয়, তবে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ দিয়ে এরা পৃথিবীকে ভাগ করে নিতে পারবে নিজেদের মধ্যে। ১৪৯৩ সালে ক্যাথলিক পোপ যেমন সমগ্র বিশ্বকে ভাগ করে দিযেছিলেন স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে 'রুল অব ডিমারকেশন' ঘোষণার মাধ্যমে, আধুনিক কালেও সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে একালীন পৃথিবী।

মানবসভ্যতার মৌল গলদ স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন স্বামীজী। বারবার তিনি তাই এই দিকটির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এস্টাব্লিশমেণ্ট গড়ে ওঠে কারণ ব্যক্তি মানুষের মধ্যেই এই বিষ লুকিয়ে আছে। জনসাধারণের মনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে লোভী ও আপোষকামী চরিত্র, যে তার সৃজনশীলতাকে শ্রদ্ধা না করে মূল্য দেয় বৈষয়িক প্রতিষ্ঠাকে। বৈষয়িক প্রতিষ্ঠার কারণে সে নিজেই মদৎ দেয় এস্টাব্লিশমেণ্টকে। ভীষ্ম-দ্রোণ থেকে শুরু করে খুশবন্ত সিং উৎপল দত্ত পর্যন্ত একই ইতিহাস। মাস্-সাইকোলজীর বড় ম্যানিপুলেটার রাজনৈতিক নেতারা এভাবেই 'পাইযে দেবার রাজনীতি'র প্রবর্তন করেন, ব্লু কলার শ্রমিককে হোয়াইট-কলার শ্রমিকে পরিবর্তন করেন, বুদ্ধিজীবীদের স্বেচ্ছামূলক দাসত্ব বরণে উৎসাহিত করেন। দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী, বামপন্থী, বিভিন্ন নামে রঙে রূপে এস্টাব্লিশমেণ্টের দাপট ও প্রভুত্ব বজায় থাকে। মানুষের মুক্তি ঘটে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: 'মানুষ কে? মান হুঁশ যার আছে।' তিনি মানুষকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে বলতেন: 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' গুরুর কথার তাৎপর্য স্পষ্টভাবে ধরতে পেরেছিলেন স্বামীজী। তিনিও বুঝেছিলেন যে মানুষের চেতনায় জাগরণ না ঘটলে, কামনা-কাঞ্চনের দাসত্ব করলে, বাবু সাজলে, এবং সর্বোপরি বিদ্যাকে চাল-কলা বাধা বিদ্যায় পরিণত করলে মানুষ এস্টাব্লিশমেণ্টের দাস হতে বাধ্য। তাই তিনি জোর দিয়েছিলেন চেতনার

বিপ্লবের ওপর। এটি না হলে উৎপাদন-মালিকানার সম্পর্ক বা ইডিওলজী বা শাসক বদল করেও সমস্থার সমাধান ঘটবেনা, এক এস্টাব্লিশমেণ্টের বদলে তৈরী হবে নতুন এস্টাব্লিশমেণ্ট। রাশিয়ায় মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের নামে স্তালিন যে নতুন এস্টাব্লিশমেণ্ট গড়ে তুলেছিলেন তা স্বীকার করেছেন পরবর্তী রুশ নেতারা। কমিউনিস্ট চীনে নতুন ধরণের এস্টাব্লিশমেণ্ট গড়ে উঠেছে দেখেই মাও-সেতুং কালচারাল রেভলিউশনের ডাক দিয়েছিলেন। 'গ্যাং অব ফোরের' সাম্প্রতিক বিচারে জানা গেল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামেও গড়ে উঠতে যাচ্ছিল নতুন আরেক এস্টাব্লিশমেণ্ট। স্বামীজী তাই চাননি বিপ্লবী ঋত্বিকরা সংগ্রামে নিজস্ব নেতৃত্ব কায়েম করে নতুন এস্টাব্লিশমেণ্ট গড়ে তুলুক। তিনি বিপ্লবীদের ঐক্য চেয়েছেন, এস্টাব্লিশমেণ্ট নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বিপ্লবের ঋত্বিক

শ্রমিক-বিপ্লব-জনসাধারণ

বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা কারা নেবে ? এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীরা ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী। স্বামীজী বলেছেন, "হে যুবকগণ, তোমরাই আমার মনের মানুষ। তোমাদের টাকাকড়ি নেই, তোমরা দরিদ্র। যেহেতু তোমরা দরিদ্র সেজন্যই তোমরা আসল লোক। যেহেতু তোমাদের কিছু নেই সে জন্যই তোমরা অকপট। আর অকপট বলেই তোমরা সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারবে[১] · হে যুবকগণ, তোমাদের মাতভূমি বলি প্রার্থনা করছে। সবল, কঠিন, আত্মবিশ্বাসী, বুদ্ধিমান যুবক চাই। পাঁচশ বছরের ইতিহাস তোমাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। হে বীর যুবকগণ, তোমরাই আমার মনের মানুষ।"[২]

লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামীজী শ্রমিক-কৃষকের কথা বারবার তুলে ধরলেও যুবকদের আহ্বান করেছেন বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা নিতে। মার্কসের সাথে স্বামীজীর পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে এখানে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে— বিপ্লবের ঋত্বিক হিসেবে শ্রমিক-কৃষকের বদলে যুবকদের ওপর এত জোর কেন দিলেন স্বামীজী ?

শ্রমিক কাদের বলা হয় ? যারা প্রধাণত দৈহিক শ্রমের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে তারা সকলেই যদি শ্রমিক হয় তবে রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা থেকে ইঞ্জিনীয়ার, এয়ারহোস্টেস সকলেই এই শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। মার্কসের মতে, শ্রমকে যারা পণ্য হিসেবে বিক্রী করে তারাই শ্রমিক। এই সংজ্ঞাটি অবশ্য তাঁর দর্শনের উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে, যদিও বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে এটি টিঁকতে পারেনা। প্লেনের ভাড়া বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে পাইলট ও এয়ারহোস্টেসদের উচ্চহারে বেতনকে অবশ্যই গণ্য করা যায়। অর্থাৎ, এখানে এরাও তাদের শ্রমকে বিক্রী করছে। বড় কোম্পানীর বিজ্ঞাপন-শিল্পী কিংবা মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভদের শ্রম কোম্পানীগুলির ব্যবসায় উদ্বৃত্ত মূল্য (সারপ্লাস ভ্যালু) বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, এ-কথাও অস্বীকার করা যায়না। এরাও কি তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ? এবং

বিপ্লবে কি এরাই অগ্রণী ভূমিকা নেবে যেহেতু মার্কসীয় মতে শ্রমিকদের অগ্রগামী অংশই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে?

মার্কস যে-যুগে তাঁর মতবাদ রচনা করেছিলেন, তখন শিল্পবিপ্লবের ফলে বড় বড় কারখানায় যারা কায়িক শ্রম দিয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য গঠনে সাহায্য করত, তাদের গরিষ্ঠ সংখ্যক অংশকেই তিনি শ্রমিক বলে ঘোষণা করেছিলেন। আধুনিক শিল্পবিন্যাস পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তার ফলে বদলে যাচ্ছে শ্রমিকদের শ্রম চরিত্র—মার্কস এটি দেখে যাননি। প্রযুক্তিবিদ্যা শ্রমিকদের শ্রেণীচরিত্রে কি প্রভাব বিস্তার করবে এ প্রসঙ্গে মার্কসের বক্তব্য ক্রমশই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার আগে আরেকটি প্রসঙ্গ আলোচনা করে নেওয়া যাক।

শ্রমিক শ্রেণী একটি স্বতঃপ্রণোদিত বৈপ্লবিক শক্তি নয়। প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজেও এই শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাদের বিপ্লবী সম্ভাবনা বিশেষ দেখা যায়নি। পুঁজিবাদী যুগের প্রথম পর্বে যখন শ্রমিকদের হাত থেকে উৎপাদনের হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া হতে লাগল, তখনই সৃষ্টি হলো সর্বহারা শ্রেণীর। অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণী সর্বহারা পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত বিপ্লবী হয়ে ওঠে না। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, আমেরিকা ও ইওরোপের শ্রমিকশ্রেণীর কথা,যারা নিজেদের অজান্তেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সাহায্য করেছিল তাদের শ্রম দিয়ে! বৃটিশ ভাবতে অসংখ্য তাঁতির অবস্থাকে দুঃসহ করে তুলেছিল বৃটিশ বণিকেরা নিশ্চয়ই, কিন্তু বৃটিশ মিল শ্রমিকেরাও সেই সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির শরিক হয়ে পড়েছিল, হয়ত অবচেতনভাবেই।

মার্কসীয় মতে উন্নত পুঁজিবাদী সমাজেই শ্রমিকদের বিপ্লবী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎবাণীটি পরবর্তীযুগে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। মার্কসীয় চিন্তায় প্রযুক্তিবিদ্যা, তার প্রয়োগ ও প্রভাব, এবং মানব চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক বিশ্লেষণ নেই। বর্তমান যুগের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন এবং বহির্বাণিজ্য প্রসূত উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমিকদের মজুরীও বাড়িয়ে তুলেছে। পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীরাও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বাড়াবার চেষ্টা করছে স্বীয় কায়েমী স্বার্থেই। উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে এটি বেশি করে প্রমাণিত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রমিক শ্রেণী সব সময়ই বিপ্লবী হতে পারে না, বরং সময় সময় এই শ্রেণীটিই পুঁজিবাদীদের সাথে হাত মেলায়। বৃটিশ ভারতের

জনগণকে শোষণ করার ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী স্বদেশীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সহায়ক শরিক ছিল। লাতিন আমেরিকার খনি শ্রমিকদের শোষণ করে কেবল মার্কিন শিল্পপতিদেরই সম্পদ বাড়েনি, মার্কিন শ্রমিকেরাও নিজেদের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়েছে। যে সব দেশ অন্য দেশে অস্ত্র বিক্রী করে, যেমন আমেরিকা-রাশিয়া-চীন-ফ্রান্স-বৃটেন, সে সব দেশের অস্ত্র-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বাড়ছে ঐ একই পরিস্থিতি অনুযায়ী। সাম্রাজ্যবাদী সরকার বা মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক শোষণের বিস্তারিত জালে শ্রমিকেরাও শরিক।

শোচনীয় আর্থিক পরিবেশ, বা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে শ্রমিকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব হলে এরা বিদ্রোহ ও বিপ্লব করতে পারে না। এরা স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক শ্রেণী নয়, পরিবেশ উন্নত হলে এদের চরিত্রে আর পাঁচটি শ্রেণীর মতোই বুর্জোয়া চরিত্র ধারণ করে। এরা যেমন সাম্রাজ্যবাদের শরিক হতে দ্বিধাবোধ করে না, তেমনি স্বীয় জীবনযাত্রায় বুর্জোয়া স্বভাব ও প্রবণতার অনুকরণ করে। উন্নত দেশগুলিতেও, এমন-কি উন্নতিশীল দেশগুলিতেও, এরা নিজেদের ছেলেমেয়েকে বুর্জোয়া স্কুল-কলেজে পড়াতে চেষ্টা করে যাতে তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, গতর খাটা কাজে তাদের জীবন যাতে নষ্ট না হয়, মেয়েরা যাতে বুদ্ধিজীবী স্বচ্ছল লোককে বিয়ে করতে পারে। অর্থাৎ, জীবন সম্পর্কে শ্রমিকদের ধ্যান-ধারণা অশ্রমিকদের মতোই। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে তবেই বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরী হয়। এবং এই পরিবেশে যে কোনও শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই বিপ্লবী হয়ে ওঠা সম্ভব, এ-বিষয়ে শ্রমিকদের কোনো একচেটিয়া অধিকারের দাবী থাকতে পারে না। স্পেনে ও বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রোহ, ইরানে ছাত্রদের গণবিদ্রোহ, চীনের কৃষক-বিদ্রোহ এটাই প্রমাণ করে। সর্বহারা প্রসঙ্গে ভারতের কথাই ধরা যাক। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের কৃত্রিম তন্তু তৈরীর মিলগুলির শ্রমিকেরা, পঃ বঙ্গে উষা ও জেসপের শ্রমিকেরা, বিহারের টাটা কোম্পানীর শ্রমিকেরা— এদের কী আদৌ সর্বহারা বলা চলে? না। বরং এদের তুলনায় এইসব রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকেরা। সর্বহারাদের অনেকটা কাছাকাছি। সর্বহারা

মানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রোলেতারীয়েৎ—মার্কসের এই ধারণাটাই আজ হাস্যকর অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এবারে প্রশ্ন—সর্বহারা বা নিপীড়িত মানুষের সংখ্যা কি পুঁজিবাদী সমাজেই বেড়ে ওঠে? হ্যাঁ, তাই। কিন্তু পুঁজি বলতে শুধু অর্থ বা সম্পদকে বুঝলে ভুল হবে। ১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ অর্থনৈতিক কারণে ঘটেনি, ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে যে নীরব বিদ্রোহ দেখা গেল তার মূলেও অর্থনৈতিক কারণ ছিল না। ১৯৬২ সালে চেকোশ্লোভাকদের রুশ-আগ্রাসনের ব্যর্থ প্রতিরোধ, ১৯৬২ সালে পোল্যাণ্ড শ্রমিক-বিক্ষোভ, মার্কিন নিগ্রোদের বিক্ষোভ, পাকিস্থানে ভুট্টোর ফাঁসির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রধানত অর্থনৈতিক শোষণের ফলে নয়, এই বিক্ষোভ বিদ্রোহগুলি তীব্র হয়েছিল মানবিক অধিকারের দাবী নিয়ে। মানুষের অধিকারকে সঙ্কুচিত করার চেষ্টা হয়েছিল, পুঁজিবাদী চরিত্র নিয়ে শাসক-সম্প্রদায় সমাজের মৌল সম্পদকে (জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ, শ্রমের অধিকার) কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেছিল বলেই এইসব বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল। এই যে চারটি মৌল সম্পদ, এর একটি বা একাধিককে কেন্দ্রীভূত করে কিভাবে শোষণ চালানো হয়, সে-কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি।

যথার্থ শ্রেণীহীন কারা?

'সর্বহারা' এবং 'শ্রেণীহীন' (de-classed) শব্দ দুটি অনেকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করলেও বর্তমান ভারতে এই দুটি শব্দের তাৎপর্য নিয়ে পুনর্বিচার দরকার।

গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের একজন শিক্ষক কিংবা অফিসের একজন এল-ডি ক্লার্কের মাসিক বাজেটের সাথে রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনির একজন শ্রমিকের মাসিক বাজেট তুলনা করুন। একজন শ্রমিক আর একজন শিক্ষক, দু'জনেরই মাসিক বেতন যদি ৩০০ টাকা হয়, তাহলেও এদের সমশ্রেণীভুক্ত বলা চলে না, কারণ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উভয়ের পৃথক সামাজিক সত্তা আছে। একজন শ্রমিক যখন ৩০০ টাকা মাইনে পাচ্ছে তখন সে মানসিক দিক দিয়ে তৃপ্ত, এবং অধিক মাইনের জন্য তার আন্দোলন স্বীয় স্বার্থের দিকে তাকিয়েই। এই স্বার্থেই সে নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যাশী। বিপরীত

দিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন মূলত ন্যায়সঙ্গত সম্বন্ধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নতুন সমাজব্যবস্থার দাবীতে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি এই দুই দলের মধ্যে এমন একটা পার্থক্য সৃষ্টি করেছে যে মাইনে বাড়িয়ে শ্রমিকদের শান্ত রাখা যায়, কিন্তু মধ্যবিত্তদের শান্ত রাখা যায় না। অর্থাৎ মানসিক দিক দিয়ে মধ্যবিত্তেরাই অধিকতর শ্রেণীহীন বা ডিক্লাস্ড।

এই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরাই মানসিক দিক দিয়ে যথার্থ সর্বহারা এবং শ্রেণীহীন। কারখানা বা খনিতে কোনো শ্রমিক অবসর নিলে তার ছেলে চাকরী পায়, কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের সেই সুযোগ নেই। ভবিষ্যতের ব্যাপারে একজন ধনী বা শ্রমিকের যেটুকু নিরাপত্তা আছে, তা একজন মধ্যবিত্ত ছাত্রের নেই। তাকে নিজের কৃতিত্বেই তা অর্জন করে নিতে হয়। কিছু বিলাসদ্রব্যকে (লাকসারী গুড্স্) প্রয়োজনীয় দ্রব্য (এসেনশিয়াল্ গুড্স্) বলে গণ্য করায় এবং সাংস্কৃতিক চর্চার ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের বাজেটে যে অতিরিক্ত চাপ পড়ে, তার ফলে ঐসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের হাত-খরচের টাকা ধনী ও শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম। এসব দিক বিচার করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক দিক থেকে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা অন্যান্যদের চেয়ে পিছিয়ে আছে। বিপরীত দিকে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকার ফলে নতুন সমাজ গঠনের ব্যাপারে শ্রমিক কৃষকের পক্ষে দূরদৃষ্টির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, ধনী সম্প্রদায়ও স্বীয় স্বার্থে এ-ধরণের দূরদৃষ্টির পরিচয় দেবেনা। কিন্তু এই অসুবিধেগুলি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। তুলনামূলকভাবে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই শ্রেণী-স্বার্থের চেয়ে ন্যায়সঙ্গত সমাজগঠনে বেশি আগ্রহী বলে তারাই মানসিক দিক দিয়ে অনেকটা ডিসক্লাস্ড্।

শ্রমিক-কৃষককে শরিক করে মধ্যবিত্ত যুব-সম্প্রদায় নতুন সমাজ গঠনের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত, কিন্তু কোন বিশেষ শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র তারা মানতে প্রস্তুত নয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাদের সামাজিক অন্যায় সম্বন্ধে সচেতন করেছে, কিন্তু সেই সাথে করেছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপাসক। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই মানসিক অবস্থা বুঝতে না পেরেই অনেকে এই সম্প্রদায়কে প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য করেছেন।

এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, বিশেষত এর যুবকেরাই হলো যথার্থ স্বতঃপ্রণোদিত

বিপ্লবের ঋত্বিক

বৈপ্লবিক শক্তি, শ্রমিক কৃষক নয়। বর্তমান বিশ্বে যে বিরাট প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটে গেছে তাতে শ্রমিক-কৃষকের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে এদের সঙ্গে আপোষ করার। কিন্তু কি ধনতান্ত্রিক সমাজে, কি মার্কসবাদী রাষ্ট্রে· মধ্যবিত্তশ্রেণী আজও বৈপ্লবিক শক্তি হিসাবে পরিগণিত। মানসিক দিক দিয়ে শ্রেণীহীনের সংখ্যা এদের মধ্যেই বেশি। এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশে যে সংকট দেখা দেয়, তাতে এই শ্রেণীর বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও দেখি একই প্রবণতা। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় একদিকে যেমন সমাজে বৌদ্ধিক প্রভাব বেশি বিস্তার করছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রশক্তির (ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে) কাছে এরাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে।

এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কি চাইছে? সারা বিশ্বেই তারা চাইছে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র। সমষ্টি সত্তার যূপকাষ্ঠে তারা নিজেদের জীবন বলি দিতে রাজী নয়, তেমনি রাজী নয় কোনোরকম সামাজিক বৈষম্যকে মেনে নিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া আফ্রিকায় যে সব দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাদের মধ্যে আজ দুই শিবিরের বাইরে তৃতীয় বিশ্বের শরিক হওয়া। প্রবল প্রবণতা। এদের পাশাপাশি ইওরোপ ও এশিয়ার নতুন মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলিও 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র'-এর বদলে জনগণতন্ত্রের শপথ নিচ্ছেন। এসব দেশের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের প্রভাব ক্রমবর্ধমান বলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষাপট নবরূপ পেয়েছে। পুঁজিবাদ কি বা মার্কসবাদকে অনুসরণ না করে বিকল্প একটা পথ বেছে নেওয়ার জন্য সবাই উদগ্রীব। 'রুটি কিংবা স্বাধীনতা' এই তত্ত্ব বাতিল করে দিয়ে বিশ্বের নতুন সমাজ আজ দুটোর স্বপক্ষেই রায় দিচ্ছে। ১৯৭৭ সালে ভারতের লোকসভা নির্বাচন, ১৯৮০ সালে পোল্যাণ্ডের শ্রমিক ধর্মঘট ইরানের গণবিদ্রোহ, চেকোশ্লোভাকিয়ার গণবিক্ষোভ ইত্যাদি ঘটনা এরই প্রতিফলন।

সমাজের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশ এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কিন্তু মাঝে মাঝেই প্রতিক্রিয়াশীলের মতো ব্যবহার করে। কেন? কারণ সাম্প্রতিক পৃথিবীর উপযোগী কোনো সামাজিক দর্শন তারা খুঁজে পাচ্ছে না। নেতৃত্বের

দেউলেপনা এবং ভাবাদর্শের সাধনে পথের সংকট তাদের প্রায়ই বিভ্রান্ত করে তোলে, আর এই বিভ্রান্তির ফলে সমাজ পরিণত হয় আগ্নেয়গিরিতে। যে সব রাষ্ট্র বা সমাজ দর্শনের কথা আমরা বইয়ে পড়ি, তা বর্তমান পৃথিবীতে ক্রমশই অপ্রাসঙ্গিক হযে পড়ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের ও সমাজ-পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন কোনো দর্শনের দিশা কেউ দিতে পারছে না। ফলে আধুনিক সমস্যাবলীর মোকাবিলা করার কোনো বৌদ্ধিক হাতিয়ার পৃথিবীতে দুর্লভ হয়ে পডছে।

যুব সম্প্রদায়

মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে অধিকতর বিপ্লবী-সম্ভাবনা থাকলেও পেশাদার লোকদের চেযে যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই সম্ভাবনা সুপ্রচুব। বস্তুত যুব-সম্প্রদায়ই স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক শ্রেণী। ১৯৬২-তে ফ্রান্সে ছাত্র-বিক্ষোভ, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, আমেরিকায় ভিয়েৎনাম-যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ইরানে শাহ্'র পতন, বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম, শ্রীলংকার ব্যর্থ অভ্যুত্থান, ভারতে নকশালপন্থী আন্দোলন—এইগুলিতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল যুব-সম্প্রদায়ই। বৃটিশ ভারতের সরকারী সিডিশন কমিটির রিপোর্টে ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় বৈপ্লবিক ঘটনায় নিহত ও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে ৮৫% এরই বয়স ছিল ১৬ থেকে ৩০ বছর, এদের মধ্যে আবার ৫০%-এর বয়স ছিল ২১ থেকে ২৫-এব মধ্যে। পেশাগত দিক থেকে শতকরা ৭০ জনই ছিল ছাত্র, শিক্ষক, বেকার, কেরাণী।

বিদ্রোহ করা তরুণের ধর্ম। যৌবন ছাড়িয়ে মানুষ যখন প্রৌঢ়ত্বের দিকে পা বাড়ায় তখন থেকেই মানুষ হিসেবী হয়ে ওঠে; জীবনের চেয়ে জীবিকাই তার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। ফলে সে মানুষ দক্ষিণপন্থী বামপন্থী যাই হোক না কেন, মেপে মেপে পা ফেলে। এইসব মানুষেরা বি-বা-দী বাগে গলায় গাঁদাফুলের মালা পরে অনশন ধর্মঘট করতে পারে উচ্চহারে বেতন, ডি-এ, বোনাস, ছুটির সুযোগ-সুবিধের জন্য, কিন্তু এরাই বাড়ি ফিরে ঝি-চাকরদের এসব সুযোগ-সুবিধে দিতে নারাজ। এরা মুখে বিপ্লবের কথা বলবে, শ্লোগান দেবে, মিটিং করবে, কিন্তু এরাই আবার প্রাইভেট টিউশনীর

নামে কালো টাকা উপার্জন করবে, অফিসে ঘুষ খাবে, নিজেদের কর্তব্যে অবহেলা করবে। এই নির্লজ্জ আচার-আচরণ তরুণের ধর্ম নয়। তরুণদের সমস্যা স্বতন্ত্র। এগিয়ে চলা তাদের বয়সের ধর্ম,তাদের জীবনের বর্তমান-ভবিষ্যৎ আছে, সর্বোপরি চারিত্রিক দিক থেকে এরা অ্যান্টি-এস্টাব্লিশমেণ্টের সমর্থক। ধনতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক কোনও সমাজেই এরা স্থিতাবস্থায় তৃপ্ত নয়, নতুন নতুন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলাই এদের ধর্ম। এদের এই বিদ্রোহ অঙ্কুরিত হয় বাড়িতে, গুরুজনদের গতানুগতিক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে। ক্রমশ সে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে স্কুল-কলেজ-বিদ্যালয়ে, সেখান থেকে বৃহত্তর সমাজে। স্বাভাবিক তারুণ্যের শক্তিতে তারা বড়দের মতো হিসেব করে চলার চেয়ে বেপরোয়া ঝুঁকি নিয়ে জীবনের মুখোমুখি হতে চায়। পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দের চিরাচরিত ব্যাখ্যায় তারা সন্তুষ্ট নয়। বড়রা যা নিয়ে সন্তুষ্ট, তৃপ্ত, এমনকি গর্ববোধও করে, সেই উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের নানান ব্যাখ্যা, শিল্প-সাহিত্য, এর কোনকিছুই তরুণদের তৃপ্ত করতে পারে না। কারণ তারা চোখের সামনেই দেখছে মানবসভ্যতার এসব বড় বড় অবদান থাকা সত্ত্বেও সমাজে অসহায় লাঞ্ছিত মানুষের সংখ্যাই বেশি। তরুণদের কাছে জীবিকা নয়, জীবনই বড়। একদিকে তারা তাই অ্যান্টি-এস্টাব্লিশমেণ্ট মানসিকতা প্রকাশ করে বিদ্রোহের মাধ্যমে, অন্যদিকে চেষ্টা করে নিজস্ব সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করতে। ডিরোজিওর ইয়ংবেঙ্গল থেকে সুরু করে গত দশকের নকশালপন্থী আন্দোলন, ফ্রান্সে ছাত্র বিক্ষোভ, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব থেকে আমেরিকা-ইওরোপের হিপি-প্রবণতা—তরুণদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরেছে। তরুণদের এই সামাজিক শ্রেণীসত্তা বুঝতে পারেন না বলেই বড়রা এদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সব সরকারের কাছেই এরা এক বিরাট সমস্যা। সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তরুণদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে না বলেই বড়রা এদের সমালোচনা করেন। মানুষ যৌবনের সীমা ছাড়ালেই ধীরে ধীরে এস্টাব্লিশমেণ্টের সমর্থক হয়ে পড়ে নিজস্ব নিরাপত্তার খাতিরেই। দক্ষিণপন্থীই হোক আর বামপন্থীই হোক, এস্টাব্লিশমেণ্টের মূল চরিত্র একই। আর তারুণ্যের ধর্ম এই এস্টাব্লিশমেণ্টকে প্রত্যাখ্যান করা, নিজস্ব সৃজনশীলতায় উন্মুখ হওয়া।

একদিকে এস্টাব্লিশড সমাজের বাঁধন অস্বীকার, অন্যদিকে সঠিক

[একশ' তের]

আদর্শের সন্ধান না পেয়ে তরুণদের এক বিরাট অংশ আজ তাই বিপ্লবের বদলে বিদ্রোহকে বেছে নিয়েছে, রেভলিউশ্যনের বদলে রিবেলিয়ানকে। এই তরুণ সমাজের প্রাণশক্তিকে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন অনেক মনীষীই, কিন্তু বিবেকানন্দ গভীরভাবে মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলেন এই যুবশক্তির। সেজন্যই তিনি তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "যেহেতু তোমাদের কিছু নেই, সেজন্যই তোমরা অকপট। আর অকপট বলেই সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারবে।... সবল, কঠিন, আত্মবিশ্বাসী, বুদ্ধিমান যুবক চাই। পাঁচশ বছরের ইতিহাস তোমাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। হে বীর যুবকগণ, তোমরাই আমার মনের মানুষ।"[৩] স্বামীজী একদিকে যেমন তরুণদের বিদ্রোহের চরিত্র লক্ষণটিকে দেখিয়ে দিলেন, অন্যদিকে দেখালেন গঠনমূলক পথে কিভাবে বিদ্রোহকে বিপ্লবে পরিণত করতে হবে।

আজ তাই প্রয়োজন নতুন দর্শনের। এশিয়া-আফ্রিকা ইওরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের যুব সমাজের অস্থিরতা দূর করার জন্য চাই নতুন চিন্তা, নতুন পথ। আর এই দর্শনের ভিত্তি হবে মানবতাবাদ, যার প্রধান লক্ষ্য হবে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। মানুষ মূলত অর্থনৈতিক জীব নয়, কারণ আর্থিক নিরাপত্তা মানুষকে চিন্তা করার অবসর দেয়, কিন্তু আর্থিক নিরাপত্তা থাকলেই মানুষ চিন্তাশীল হয়ে উঠবে এমন কোনো কথা নেই। আসলে শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা এমন করে তুলতে হবে যাতে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে। মুক্ত চিন্তার প্রবাহ বজায় থাকলেই মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটে। জোর করে কতকগুলি আইন চাপিয়ে দিলেই মানুষ নীতিবাদী হয়ে ওঠে না। যা প্রয়োজন তা হলো মানুষের মানবিক শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ।

খাওয়া পরা মেটানো মানুষের দৈনন্দিন কাম্য। কিন্তু মানুষের সমগ্র দৃষ্টি যদি ঐ দিকেই নিবদ্ধ রাখার শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে পরিণামে তা অকল্যাণকর হয়ে দাঁড়ায়। তার বদলে মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলতে হবে। তার মধ্যে যে অসীম ক্ষমতা আছে, সে যে ইচ্ছে করলে নতুন সমাজ গঠনের ঋত্বিক হতে পারে, এই সুদৃঢ় আশাবাদের সঞ্চার করতে হবে। মানুষকে যদি আত্মবিশ্বাসী করে তোলা যায়, তবে নিত্য নতুন সমস্যার

মোকাবিলা সে নিজেই করবে। স্বীয় স্বাধীনতা পরের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতি আকর্ষণ—এই মানসিকতাকে সে ঘৃণা করতে শিখবে। অর্থনৈতিক সংকটের চেয়ে চিন্তার সংকটদূর করার জন্যই প্রয়োজন নতুন দর্শন। এই নতুন দর্শনই পারবে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে ছন্দ রেখে পথ নির্দেশ করতে। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি সকল ক্ষেত্রেই এই নতুন দর্শনের আবহন জানিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

মধ্যবিত্তদের ওপর খুবই জোর দেওয়া হয়েছে বিপ্লবের ঋত্বিক হিসেবে। এর অর্থ কি নিম্নবিত্তদের অস্বীকার করা? তা নয়। উচ্চবিত্তদের ওপর স্বামীজী ভরসা রাখেননি। তাঁর ভাষায়—"তোমরা হচ্ছে দশ হাজার বছরের মমি! ...তোমরা হ'লে 'চলমান শ্মশান'। তোমাদের সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর বেশী দেরী করছ কেন? কেন তাড়াতাড়ি ধুলিতে পরিণত হয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছো না?"[৪] বিপরীত দিকে তিনি লক্ষ্য করেছেন—শিক্ষার অভাব, বহির্জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, নিম্নমানের জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য শ্রমিক-কৃষকের পক্ষে এই মুহূর্তে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অন্য দুটি শ্রেণী থেকে কিছুটা এগিয়ে আছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মানসিকতা থাকার ফলে বর্তমানে তারাই বিপ্লবের ঋত্বিক হবার পক্ষে অধিক উপযোগী। এই সম্প্রদায়টির মধ্যে যুব গোষ্ঠীর ওপরই স্বামীজী ভরসা করেছেন বেশি। এর অর্থ এই নয় যে, নিম্নবিত্ত বা শ্রমিক কৃষকের যুবকেরা বিপ্লবী হতে পারে না। স্বামীজী লক্ষ্য রেখেছেন মানসিকতা বা চেতনার ওপর। এই চেতনা যার মধ্যে আছে সেই বিপ্লবী হতে পারে। স্বামীজী যা চেয়েছেন তা হলো যুব-সম্প্রদায় বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে তুলুক। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার চেয়ে অনুঘটক (catalyst) হিসেবে কাজ করতেই তিনি ঋত্বিকদের বা যুব সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায় ঃ বিপ্লবের বিরোধী শক্তিসমূহ

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

প্রচুর রক্তপাত, অশেষ কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে আমরা একদিন এসে পৌঁছেছিলাম শরতের সকালে—আজ থেকে ৩৪ বছর আগে। স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল না হতেই আর এক স্বপ্ন রঙীন করে তুলেছিল আমাদের চেতনাকে। নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ হয়ে ওঠার আগ্রহে আমাদের যাত্রা হয়েছিল শুরু। সামনে ছিল দুটি সমস্যা—সবাইকে পেট পুরে খেতে দিতে হবে, শিল্প বিনিয়োগের হার বাড়িয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে। স্বাধীনতার সময় আমাদের খাদ্যশস্য খুব একটা কম ছিল না, ঘাটতি ছিল মোট চাহিদার মাত্র ৫%। ভাবা গিয়েছিল সেচ ও সারের ব্যবস্থা করে এবং জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করে এই ঘাটতি মিটিয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু ১৭ বছর পর দেখা গেল খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৩০% বাড়লেও সবাইকে পেট পুরে খেতে দেবার সমস্যাটা আরও তীব্র হয়েছে। ভবিষ্যতে কৃষিক্ষেত্রে মানুষের চাপ বাড়বে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের জন্য—এই সহজ সত্যটা আমরা যেমন বুঝলাম না, তেমনি গ্রামের অল্পে সন্তুষ্ট কৃষকেরাও পারিবারিক চাহিদার সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে এগিয়ে এলেন না উৎপাদন বৃদ্ধির আকাশ ছোঁয়া উৎসাহ নিয়ে। আবার, শিল্পে বিনিয়োগের হার দ্রুত বাড়াতে গিয়ে নজর দেওয়া হল ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে ; কিন্তু নজর দেওয়া হল না এসব জিনিস ভোগ করার সামর্থ্য ক'জনের আছে ? সিনথেটিক রেয়ন, ফ্রীজ, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, টিভি'র সীমাহীন উৎপাদনের চাহিদা সামাল দিতে গিয়ে মধ্যবিত্ত সাম্প্রদায়কে স্বচ্ছল করে তোলার চেষ্টা হলো পে-স্কেল; বোনাস ইত্যাদি বাড়িয়ে।

এ সত্ত্বেও স্বর্গের সিংহদ্বারে পৌঁছুতে পারলাম না আমরা। দেশের ডান বাম সব রাজনৈতিক নেতারা তাদের হাঁক কমালেন না। ব্রাহ্মসমাজের মতো তারাও সব ধর্ম থেকে ভাল ভাল জিনিস মিশিয়ে নববিধান তৈরীর চেষ্টা করলেন। মার্কিন গণতন্ত্র ও রুশীয় পরিকল্পনার ককটেল আমাদের বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। সমাজতন্ত্র না গণতন্ত্র, এ বিষয়ে

মন স্থির করতেই আমরা পারলাম না। এই দোদুল্যমান অবস্থাতে ঢেউয়ের ধাক্কায় ধাক্কায় যতদূর এগানো যায় প্রাকৃতিক নিয়মে, তাই করতে লাগলাম আমরা। বামপন্থী নেতারা চাইলেন সাত-তাড়াতাড়ি রাশিয়ার আদর্শে এগিয়ে যেতে ; তারা কখনও বিচার করলেন না এ দেশের মাটিতে নতুন গাছ বেড়ে উঠতে পারবে কিনা। বিপরীত দিকে, কংগ্রেসী নেতারা রাশিয়া আমেরিকার কাকে আদর্শ করবেন এটি ঠিক করতে করতেই কাটিয়ে দিলেন বহুদিন !

আদর্শের ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের এই অস্থিরতা থাকলেও একটি বিষয়ে তারা সহমত ছিলেন—ক্ষমতা চাই। শাসক দল চাইল যেন তেন প্রকারেণ গদী ধরে রাখতে, আর বিরোধী দলগুলি চেষ্টা করে যেতে লাগল ভাল মন্দ যে কোনও পথেই হোক ক্ষমতায় আসতে। মূল লক্ষ্যটি এভাবে স্থির হয়ে যাওয়ায় আদর্শের ব্যাপারে সব দলই বাস্তবের সঙ্গে আপোষ করে নিল। ফলে কর্মসূচীর সাথে আদর্শের ফারাক ঘটে গেল। এইভাবে জাতীয় উন্নতির প্রশ্নটি রইলো উপেক্ষিত। নির্বাচনের তাগিদে জনসাধারণকে দলীয় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চলতে লাগল যার ফলে জাতীয় স্বার্থ ও দলীয় স্বার্থের মধ্যে লাগল সংঘাত। শাসক দলগুলি চাইল জনসাধারণকে পাইয়ে দেবার রাজনীতির মাধ্যমে নিজেদের সমর্থক করে তুলতে, আর বিরোধীরা চাইল জনগণকে দাবীমুখর করে তুলে শাসক দলগুলিকে বেকায়দায় ফেলার, এইভাবে শাসক ও বিরোধী সকল নেতাই হয়ে উঠলেন চরম প্রতিক্রিয়াশীল। আদর্শ ও কর্মসূচীর মধ্যে চলল জাতীয় স্বার্থ ও দলীয় স্বার্থের মধ্যে।

নেতৃত্বের এই দেউলেপনা ক্রমশঃ সংক্রামিত হলো জনসাধারণের মধ্যে। স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ভিড় করতে লাগলেন পেশাদারী রাজনীতিবিদেরা। দিন যতই এগোতে লাগল, আদর্শনিষ্ঠ পুরুষেরা ততই সরে যেতে লাগলেন রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে। ক্ষমতা দখলই যখন মুল উদ্দেশ্য, তখন পেশাদারী রাজনীতিবিদেরা আদর্শের বালাই ঝেড়ে ফেলে মঞ্চে আবির্ভূত হলেন ভাড়াটে গুণ্ডা আর ঠ্যাঙাড়ে মস্তান বাহিনী নিয়ে। দল রাখতে যে টাকার দরকার তা এল ব্যবসায়ী মহল থেকে। দক্ষিণ ও বাম দলগুলির নেতারা এই টাকা দিয়ে অবস্থার সামাল দিতে চেষ্টা করলেও

পাড়ায় পাড়ায় যেসব উঠতি ছোট ছোট নেতার আবির্ভাব হলো, তারা টাকার সমস্যাটা মেটালেন ছোট ব্যবসায়ীদের চোখ রাঙিয়ে। এইসব উঠতি ছোট নেতারা দেখলেন যে নির্ব্বাচনে দাদারা তাদের সাহায্যেই জয়লাভ করেন। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ছোট নেতারা পাড়ার মাস্তান হয়ে যা ইচ্ছে করে যেতে লাগলেন। বড় দাদারা এসব দেখেও চুপ করে রইলেন, কারণ নির্বাচনে এই পাড়ার মাস্তানেরাই একমাত্র ভরসা। এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা দাঁড়াল নবাব ও সামন্ত পর্যায়ে। একদিন সামন্তেরা নিজেদের অঞ্চলে যা ইচ্ছে করার সুযোগ পেতেন, পরিবর্তে নবাবকে বাৎসরিক খাজনা ও যুদ্ধে সৈন্য যোগান দিতে হত। আজ ঠিক এই জিনিসই চলছে বড় রাজনৈতিক নেতা ও তাদের সমর্থক পাড়ার ও গ্রামের মাস্তানদের মধ্যে।

আদর্শবান জ্ঞানী-গুণীরা যতই সরে যেতে লাগলেন, রাজনীতি মঞ্চকে ততই বেশি করে কবজা করতে লাগল পেশাদারী রাজনীতিবিদের দল, যারা সামাজিক ও রাজনৈতিক, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মকুশলতায় দুর্বল। একটা দেশকে গড়ে তুলতে গেলে যতখানি ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়, এইসব পেশাদারী রাজনীতি-বিদের তা নেই। ফলে গরম গরম শ্লোগান আওড়ালেও বাস্তব ক্ষেত্রে এরা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিতে লাগলেন। আজ এমন মন্ত্রী খুব কমই আছেন যিনি কোনো আই এ এস আমলার সাহায্য ছাড়াই কাজ করতে পারেন। আই এ এস অফিসাররা প্রশাসনিক কাজকর্মে দক্ষ হলেও তিনটি বিষয়ে এরা আলাদা। প্রথমত, এরা কোনো সামাজিক আদর্শের ধারক নন। ফলে রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থার সঠিক জনমুখী উদ্যোগ নেওয়া এদের নেতৃত্বে অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। তারা একটা সংস্থার পরিচালনায় দক্ষ হতে পারেন, কিন্তু কোন সংস্থা কতখানি সামাজিক ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে প্রায় অজ্ঞ। দ্বিতীয়ত, এই অফিসারেরা যখন দেখেন যে অত্যন্ত সাধারণ মেধা ও বুদ্ধির লোক মন্ত্রী হবার সুবাদে তাদের ওপর কতৃত্ব ফলাচ্ছেন, তখন স্বভাবতই তারা রি-অ্যাকট করেন। বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় মুর্খে'র নেতৃত্ব মেনে নেওয়া। তৃতীয়ত, রাজনীতিবিদেরা মন্ত্রী হবার দৌলতে যেসব গোপন কাজকর্ম করতে চান, তা আই এ এস অফিসারদের

কাছে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। অফিসারেরা যখন এইসব গোপন কার্যকলাপ জানতে পারেন, স্বভাবই তারাও আর আদর্শ অনুসারী হতে নিরাশ বোধ করেন।

আদর্শবান জ্ঞানী গুণীরা যেমন সরে যাচ্ছেন, তেমনি আদর্শবান স্বাধীন বুদ্ধিজীবীরাও সরে আসছেন রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে। রাজনীতি করা বুদ্ধিজীবীরা আজ অধিকাংশই কমিটেড কোন না কোন দলের প্রতি। এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ যতখানি জনস্বার্থের অনুসারী, তার চেয়ে অনেক বেশি স্বীয় স্বার্থের অনুসারী। জাগতিক সাফল্যের তীব্র আকাঙ্খায় তারা হয় পেশাদারী রাজনীতিবিদদের কিংবা ব্যবসায়ীদের পোষ মানা হাতিয়ারে পরিণত হয়েছেন। স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের অভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সমাজ। এরা আর কিছু না পারুন, অন্ততঃ জনসাধারণকে সতর্ক রাখতে পারতেন, পেশাদারী রাজনীতিবিদ ও পোষমানা বুদ্ধিজীবীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সমাজের বিবেককে জাগ্রত রাখতে পারতেন। দু-একজন ফনীশ্বর নাথ রেণু হয়তো সমাজকে বদলে দিতে পারবেন না, কিন্তু এদের প্রতিধ্বনি দিকে দিকে উঠলে সামাজিক মানুষ অন্ধকারে পথ হারাত না। ইওরোপ বা আমেরিকায় স্বাধীন বুদ্ধিজীবীরা যে ভূমিকা পালন করছেন, আমাদের দেশে তা না হওয়ায় তাত্ত্বিক দিক থেকে সমাজ অস্থির আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে চলছে, যার লক্ষণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও স্পষ্ট। পত্রিকার সাংবাদিকেরা সামাজিক শক্তির কল্যাণী রূপটি তুলে ধরার চেয়ে রাজনৈতিক নোঙরামীর ছবি আঁকতেই বেশি ব্যস্ত। শিক্ষক অধ্যাপকেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিকে রাজনীতির হাত থেকে বাঁচানোর বদলে ঐগুলিকে রাজনীতির আখড়া করে তুলতেই সাহায্য করেছেন। সাহিত্যিকেরা মৌল চিন্তার চেয়ে 'বাজারে মাল' ছাড়তেই বেশি আগ্রহী।

রাজনৈতিক নেতা, আমলা ও বুদ্ধিজীবীদের এই দ্বৈত চরিত্র জনসাধরণের মধ্যেও প্রতিফলিত। ভূমীহীন কৃষকদের এক আধ কাঠা জমি বিলিয়ে ভূমিসংস্কার হতে পারে, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ এই ছিটেফোঁটা দানেও আগামী প্রজন্মে একই সমস্যা দেখা দেবে। সমবায় প্রথায় চাষ করা শুরু না করলে কৃষি সমস্যার মৌল সমাধান সম্ভব নয়। বর্তমানে বামপন্থীদের তথাকথিত ভূমিসংস্কার 'ক্যাচি শ্লোগান' হতে পারে,

কিন্তু দূরদৃষ্টির অভাবই সূচিত করে। দেশের কোটি কোটি কৃষক আজ আলাদা আলাদা ভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কোন ফসল তারা বাড়াবেন, কোন ফসল কমাবেন। তাছাড়া তারা অধিকাংশই আজও সহজ গণিতে বিশ্বাসী ; তাদের বাপ ঠাকুর্দা যে হিসেবে অঙ্ক কষে কাজ করতেন-এত মণ ধান বীজের জন্য, তাহলে এত মণ ধান উৎপন্ন হবে, মজুরী ইত্যাদি বাবদ কত মণ চাল দিলে কত মণ থাকবে সংসারের জন্য—মোটামুটি সেই হিসেবেই আজকের কৃষক ও কাজ করেন। নতুন কোনো ফসল তোলা, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাড়তি কিছু খরচ করা - এ ধরণের উচ্চাশায় অধিকাংশ কৃষকই উৎসাহী নন। বর্তমান কৃষি ব্যবস্থায় তাই কোনো ব্যাপক পরিকল্পনা সম্ভব নয়। কৃষকেরা একদিকে উচ্চাশায় অনুৎসাহী, অন্যদিকে শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনায় আস্থাহীন, কারণ সংসারে আরেকটি নতুন শিশু আসার অর্থ ই হল কৃষিকাজে আরেকজন সহকারীর আগমন। কৃষি পরিকল্পনায় আরও নানান সমস্যা আছে, কিন্তু কৃষকদের এই সাবেকী মানসিকতা দূর করার চেষ্টা বাম ও দক্ষিণ কোনও নেতাই করছেন না। অন্ধ্র-আসাম-কর্ণাটকের বাড়তি চাল, পাঞ্জাব-হরিয়ানার বাড়তি গম, উত্তর প্রদেশের বাড়তি চিনি তাই ভারতের দারিদ্রতম জনসাধারণের কোনো উপকারে লাগছে না।

অনুরূপ অবস্থা শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও। দাবীমুখর আন্দোলনে শ্রমিকেরা নিজেদের অবস্থা অনেকখানি ভাল করে তুলেছেন, কিন্তু জন সাধারণ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে, ইওরোপ আমেরিকার মতই এ দেশের শ্রমিকেরাও কেমন সুন্দরভাবে মালিকদের সহকারী হয়ে উঠেছেন। শ্রমিকদের উচ্চহারে বোনাস ডি-এ ইত্যাদি দিতে গিয়ে মালিকেরা বাড়তি টাকা নিচ্ছেন ক্রেতাদের কাছ থেকে বাড়তি দাম হিসাবে, নিজেদের লাভের জন্য ঠিক রেখেই। মালিকদের দুই প্রস্থ খাতার হিসাব, খাবারে ভেজাল দেবার অভিসন্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের চেয়ে বিলাসদ্রব্য উৎপাদনে সক্রিয় হবার প্রণালী—এই সবকিছুই শ্রমিকেরা জানেন, জাতীর স্বার্থ ও জনসাধারণ কিভাবে এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে একথাও শ্রমিক নেতাদের অজানা নয়। এসব জেনেও তারা চুপ, কারণ তারা আজ মালিকের শোষণের প্রচ্ছন্ন শেয়ার হোলডার। বিপরীত দিকে, রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্পসংস্থাগুলিতে শ্রমিক নেতাদের হাতে পরিচালনার ক্ষমতা দিলেও তারা এ বিষয়ে চরম অযোগ্যতা দেখান, কেউবা

ছয় মাসের মধ্যেই ডাইরেক্টদের পদ ছেড়ে পালান। ফলে হয় এগুলি কোটি কোটি টাকা লোকসান খায়, না হয় পরোক্ষভাবে গিয়ে পড়ে আবার ব্যবসায়ীদের হাতে। ইওরোপ আমেরিকায় শ্রমিকদের পরোক্ষ সাহায্যেই শিল্পপতিরা শোষণ চালাচ্ছেন। আমাদের দেশের বড় বড় শিল্পসংস্থার শ্রমিকেরা কি একই ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র দেখাচ্ছেন না?

বাকী রইলেন সরকারী কর্মচারীরা। সরকারী প্রশাসকদের দৈন্য যেখানে আদর্শের, সরকারী কর্মীদের দৈন্য সেখানে মানসিকতার। অফিসে অফিসে কোঅর্ডিনেশন কমিটিকে শক্তিশালী করে এবং ইউনিট কমিটিকে সর্বেসর্বা করেও কিছু সুফল হচ্ছেনা; সরকারী অফিস সম্বন্ধে জনসাধারণের অভিজ্ঞতা আজও একই। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিবাদ করেছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারা বুঝেছিলেন, দীর্ঘদিন কাজ না করলে মানুষের কর্মদক্ষতা লোপ পায়। স্বাধীনতার পর বামপন্থী নেতারা সরকারী কর্মীদের দীক্ষিত করে তুলেছিলেন আলস্যের মন্ত্রে। আজ তাই গদীতে বসে কর্মযজ্ঞে আহ্বান জানালেই কর্মীরা এগিয়ে আসবেন কি করে! যে গঙ্গানদী গোমুখী থেকে যাত্রা শুরু করে মরু উপত্যকা পেরিয়ে সাগরে সঙ্গমে উপনীত, সেই নদীকে রাতারাতি গোমুখীতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিত খাতে বইয়ে দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হবেই।

তাহলে দেখছি, যে সামাজিক শক্তিগুলির ওপর জাতীয় উন্নতি নির্ভরশীল বলে মনে করা হচ্ছে, সেই শক্তিগুলিই মানসিকতায় অনগ্রসর, প্রতিক্রিয়াশীল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রীরা, আমলা বাহিনী, সরকারী কর্মী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কৃষক—কোনো ফ্রন্টেই আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। তাদের মানসিকতা যে শুধু বর্তমানকেই পূতিগন্ধময় করে তুলেছে তা নয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে ভবিষ্যতকেও।

আমাদের দেশে সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে যে-অবস্থাটি দেখা দিয়েছে তা হল বড় ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ ও সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তদের গোপন আঁতাত। এই অশুভ জোট আজ সুস্থ সমাজ গঠনের পথে এক বিরাট বাধা। বিপ্লবীদের এ-সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। সেই সাথে আরও দুটি সম্প্রদায় স্বীয় কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করায় এই অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এরা হলেন বুদ্ধিজীবী ও সরকারী কর্মী। বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক

এস্টাব্লিশমেন্টের সেবা করতে পেরেই ধন্য ; বিবেকের নির্দেশে তারা সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষে না দাঁড়ালে অশুভ ব্যবস্থাকেই মদৎ দেওয়া হবে। একই কথা সরকারী কর্মীদের সম্বন্ধে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সৎ ও বিবেকী লোক আছেন যারা ভয়বশত নিজেকে গুটিয়ে রাখছেন। এদের প্রয়োজনীয় সাহস জুগিযে বিপ্লবের অংশীদার করে তোলার দিকে নজর দেওয়া দরকার। তাহলে উপাযটা কি ? কঃ পন্থা ? অপরিণামদর্শী বাক্যবাগীশরা একবাক্যে বলে উঠবেন বিপ্লব চাই, চাই আমূল পরিবর্তন। এবং এই কথা তারাই বেশি করে বলবেন যাদের সাম্প্রতিক চরিত্র আমরা এতক্ষণ আলোচনা করে এলাম, সেই রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, বুদ্ধিজীবী, সরকারী চাকুরে, শ্রমিক আর কৃষক। এবং অবশ্যই ছাত্রেরাও। কিন্তু বিপ্লবের ধাক্কা কি এরা সামলাতে পারবেন ? নকশালী হামলা আর জরুরী অবস্থা তো এদের ভীরু চরিত্রের নগ্ন রূপটা আগেই তুলে ধরেছে ! আর ভবিষ্যতে যদি বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের আমূল পরিবর্তন ঘটে তাহলে এরা সানন্দে সেই কর্মযজ্ঞের অংশীদার হতে পারবেন তো ? সরকারী কর্মী প্রতিদিন দিনের শেষে তার টেবিলকে ফাইল মুক্ত করে উঠতে পারবেন ? শিক্ষক অধ্যাপকেরা প্রাইভেট টিউশনীর ব্যবসা বন্ধ করতে পারবেন ? এঞ্জিনীযার ডাক্তাররা কম মাইনেতে স্বেচ্ছায গ্রামাঞ্চলে যাবেন ? ব্যাঙ্ক, এল আই সি, জেসপ, টাটা, উষা, হিন্দ মোটরের শ্রমিকেরা অন্যান্য সংস্থার শ্রমিকদের মতো কম মাইনে নিতে আপত্তি করবেন না তো ? কৃষকেরা জমি ত্যাগ করে সমবায় প্রথায় পরিকল্পনা মতো চাষ করবেন তো ?

কেউ কেউ বলবেন, প্রয়োজন হলে উদ্যত দণ্ড নিয়ে এদের এইসব কাজ করাতে হবে। এরা কিন্তু একটা জিনিস ভুলে যান যে ডাণ্ডা দেখিয়ে মানুষকে বেশিদিন কাজ করানো যায় না। মহাশক্তিশালী স্তালিনও রাশিয়ার কৃষকদের সমবায় প্রথায় চাষে উৎসাহিত করতে পারেননি, যার ফলে ঐ দেশ আজও আমেরিকা থেকে গম আমদানী করে খাদ্য সমস্যার সামাল দিতে চেষ্টা করছে। মাওসেতুং রেড আর্মির সহায়তায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব করেও চীনের শিল্পোৎপাদনকে আশাব্যঞ্জক করে তুলতে পারেননি, আজ চীনের নতুন নেতারা মার্কিন ও ভারতীয় শিল্পপতিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন চীনে গিয়ে কলকারখানা খুলতে। তাহলে উপায় ? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, হাতের

কাছে আলাদীনের প্রদীপ বা পি· সি· সরকারের যাদুদণ্ড নেই। অতএব ফিরে যেতে হবে নাভিমূলে। সমস্যাটাকে বুঝতে হবে আরও গভীরে গিয়ে। গান্ধীজী যখন বলেছিলেন—"এডুকেশন ক্যান ওয়েট্ ব্যাট্ স্বরাজ কান্ট্" —তখন তার প্রতিবাদ করেছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ১৪ বছর পরে আজ চীনের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষকেরা ও ছাত্রেরা বুঝতে পেরেছেন শিক্ষাকে এভাবে বিপ্লবের নামে অবহেলা করাটা ঠিক হয়নি। আসলে জনসাধারণের মানসিকতার পরিবর্তন যদি না হয়, তবে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন তন্ত্রই বিশেষ কাজের হয় না। আজ যদি ভারতের শাসন ক্ষমতায় কোন বিপ্লবী দল আসেও তাতেই কি কিছু সুরাহা হবে? বাহ্যিক দিক দিয়ে পরিবর্তন দেখা গেলেও কাজ তো করবেন সেই মরচে ধরা ব্যক্তিরাই! নেতৃত্বে থাকবেন বিপ্লবীর মুখোশ পরা সেই নেতারাই যারা ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থবাদী। একজন হোটেল মালিক, একজন সিনেমা হলের মালিক, একজন বেনামী বাড়িওয়ালা, একজন রুশ রুবল বা মার্কিন ডলারের মাসোহারা পাওয়া বুদ্ধিজীবী—এরা মুখে বামপন্থী শ্লোগান দিতে পারেন, সমাজতান্ত্রিক রঙের মুখোশ পরতে পারেন, কিন্তু এদের পক্ষে কি সম্ভব সত্যিকারের বিপ্লবী হওয়া? সম্ভব কি বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় স্বার্থ ত্যাগ করা? এরা বিপ্লবী শ্লোগান দিচ্ছেন, কারণ এরা জানেন যে সর্বহারার একনায়কত্ব মূলত এদেরই একনায়কত্বে পরিণত হবে। এইভাবে দুধ ও তামাক একই সাথে খেয়ে চলেছেন তারা। দ্বিতীয় সমস্যা, বিপ্লবোত্তর কালে সামাজিক পুনর্গঠন কাদের সাহায্যে হবে? সরকারী প্রশাসনের যে লৌহকাঠামো বৃটিশ আমল থেকে আজও চলে আসছে, সেই সব প্রশাসক এবং তাদের অধস্তন মরচে ধরা কর্মচারীরাই কি সামাজিক পুনর্গঠনে নিয়োজিত হবেন? বছরের পর বছর যারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কিছু চিন্তা করেন নি তাদের পক্ষে কি সম্ভব রাতারাতি চরিত্র পাল্টে জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করা? পোষমানা বুদ্ধিজীবীরা কি পারবেন দাসসুলভ মনোভাব ত্যাগ করে নেতৃবৃন্দকে বাধ্য করতে কম্পাসের কাঁটার দিকে তাকিয়ে চলতে? মূল কথাটা হলো, মানসিক পরিবর্তনের কাজ এখন থেকেই শুরু না করলে ভবিষ্যতে যদি বিপ্লব আসেও তবে তা ব্যর্থ হবে প্রস্তুতির উদাসীনতায়, অনাধিকারের বিশ্বাসঘাতকতায়।

ওপরে যে ছবিটি আঁকা হয়েছে তা বর্তমান সমাজের। অতএব বিপ্লবী ঋত্বিকরা সহজেই বুঝতে পারছেন তাদের কাজ কত কঠিন। স্বামীজী কিন্তু কোনো কাজকেই অসম্ভব বলে মনে করতেন না। ১৮৯৪ সালে একটি চিঠিতে তাঁর এক অনুরাগীকে লিখেছেন—"তোমরা যদি আমার সন্তান হও তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। তোমাদের সিংহের মতো হতে হবে। আমাদের ভারতকে, সমগ্র জগতকে জাগাতে হবে। না করলে চলবে না, কাপুরুষতা চলবে না—বুঝলে? মৃত্যু পর্যন্ত অবিচলিতভাবে লেগে পড়ে থাকো।"

বিপ্লবের পথে কি কি বাধা আসতে পারে যে সম্বন্ধে বিপ্লবীদের সচেতন থাকতে হবে। প্রধানত তিনটি বড় বাধা এ-পথে দেখা যাবে। প্রথমত, মানসিক বাধা—স্বাধীন চিন্তার অভাব, কুসংস্কার ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, সামাজিক বাধা—অশিক্ষা, শোষণ ইত্যাদি। তৃতীয়ত, কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠী—পুরোহিত সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী শ্রেণী, রাজনৈতিক গোষ্ঠী ইত্যাদি।

প্রথমে জোর দিতে হবে স্বাধীন চিন্তার ওপর, যেহেতু এটির অভাবেই মানুষ গতানুগতিক ধারাতে জীবন কাটিয়ে যায়। নতুন আদর্শ, নতুন জীবন, নতুন সৃষ্টিশীলতায় নিজেকে উন্নত করার সাথে সাথে জনসাধারণকেও উদ্দীপিত করতে হবে। ২৫-৯-১৮৯৪ তারিখের এক চিঠিতে স্বামীজী বলেছেন, "বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর। [আমি] বলি, প্রথমে নিজেকে বিশ্বাস কর দেখি। Have faith in yourself—all power is in you—be conscious and bring it out." এই যে স্বাধীন চিন্তা, যার ওপর স্বামীজী বারবার জোর দিচ্ছেন, এটি নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

বিভিন্ন সম্পর্কের সমষ্টি নিয়ে সমাজ—মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, মানুষে-দলে সম্পর্ক, দলে-দলে সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলিকে সুষ্ঠু করে তোলা—যার মূল উদ্দেশ্য মানুষের বিকাশ। সব আইনের লক্ষ্য হল ব্যক্তি মানুষের বিকাশ। আর প্রথাগুলি নির্ভর করে আছে দীর্ঘকালীন বিশ্বাস ও অভ্যাসের উপর। সাধারণভাবে দেখা যায়, একটি শিশুকে তার মা-বাবা যখন শিক্ষা দেন তখন শিশুটি কতগুলি প্রথায় শিক্ষিত হয়, অর্থাৎ শিশুটির মনকে কতগুলি বিশ্বাস ও অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (conditioned) করে তোলা হয়। বড়দের

সামনে সিগারেট খেতে নেই, চেয়ারে বসে পা নাচানো উচিত নয় ইত্যাদি বিধিতে অভ্যস্ত করা হয়। শিশুটি যখন বড় হয়ে স্কুলে গেল এবং পরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল, তখন বিভিন্ন বই ও শিক্ষকদের সাহায্যে তার মনকে কিছুটা মুক্ত করে তোলার চেষ্টা হতে থাকে, সে তখন তার বিশ্বাসের পেছনে অন্তর্নিহিত কারণগুলিকে বোঝার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস বা সমাজতত্ত্বের ছাত্রদের স্যাম্পেল সার্ভে এজন্যই করানো হয়। এ-সবের ব্যবস্থা থাকলেও শিক্ষকদের মূল উদ্দেশ্য থাকে ছাত্রেরা যেন প্রচলিত তত্ত্বের বাইরে না যায়। পরীক্ষার সময় ছাত্রদের কাছে জানতে চাওয়া হয় 'বইয়ে কি আছে,' 'কি হওয়া উচিত' বা 'তোমার কি মনে হয়' এই কথাগুলি জানতে চাওয়া হয়না। স্কুল-কলেজে কখনও তুলে ধরা হয় না বইয়ে যা আছে সেটি লেখকের মত মাত্র, কিংবা শিক্ষকেরা যা বলছেন সেটি তাদের ব্যক্তিগত মত। ফলে ছাত্রদের মন নতুনভাবে কণ্ডিশনড্ হতে থাকে এবং পরবর্তী জীবন সেভাবে পরিচালিত হতে থাকে। এক বিশ্বাসের বদলে নতুন বিশ্বাসে, এক অভ্যাসের বদলেনতুন অভ্যাসে সে অভ্যস্ত হয়।এতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ মানুষ মুক্তমতির অধিকারী হতে পারেনা। মুক্তমতির অধিকারী মানুষ তখনই হতে পারে যখন সে তার অভ্যাস-বিশ্বাসের বাইরে দাঁড়িয়ে সেগুলিকে বিচার করতে পারে। আমি একজন হিন্দু, আমি একজন কমিউনিষ্ট, বা আমি একজন আমেরিকান—এই ধরণের বিশ্বাস মানুষকে স্বাধীন করেনা। আমি সত্যের অনুসন্ধানী—মুক্তমতির এই একমাত্র পরিচয়। মুক্তমতির মানুষ নিজস্ব বিশ্বাস ও বিচারকে প্রশ্ন করতে, সন্দেহ করতে সব সময়ই উদ্যোগী।

সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে তিন রকম তর্কের কথা আছে—বাদ, জল্প, বিতণ্ডা। সত্যের অনুসন্ধানে যে তর্ক তার নাম হলো 'বাদ'। নিজস্ব মত স্থাপন করার উদ্দেশ্যে যে তর্ক সেটি হলো 'জল্প'। আর শুধু পরের মতকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে যে তর্ক তা হল 'বিতণ্ডা। মুক্তমতির মানুষ জল্প বা বিতণ্ডায় উৎসাহী নয়, তার উদ্দেশ্য 'বাদ'—সত্যানুসন্ধান।

জীবন একটি বহতা নদীর মতো। কিন্তু মানুষ নিজস্ব বিশ্বাস ও অভ্যাসের সাহায্যে সেই নদীর মধ্যে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরী করে এবং শেষ পর্যন্ত সেই ঘূর্ণাবর্তে নিজেকে আবদ্ধ করে। সে নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পারে, কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে সে স্বাধীন নয়। তার কণ্ডিশনড্ মনই তাকে বদ্ধ করে ফেলে। এরই ফলে সে নিজেকে কোন বিশেষ ধর্মের, বিশেষ রাজনৈতিক মতের, বিশেষ দেশের, বিশেষ পরিবারের, বিশেষ পেশার লোক বলে ভাবে এবং বিশেষ মতের জন্য সে লড়াই করতে চায়। সে নিজেকে প্রগতিশীল না করে স্থিতিশীল করে তোলে—একটি পরিবারে, একটি মতে, একটি পেশায় সে থিতু হয়ে বসে। এই ভাবে সে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়ে দাঁড়ায় এব সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবকিছুকে বিচার করতে উদ্যোগী হয়।

বিভিন্ন বই ও শিক্ষকের মাধ্যমে মানুষ যা লাভ করে তা অভিজ্ঞতা নয়, সেটি হলো তত্ত্ব, ও তথ্য। অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ এই তত্ত্ব ও তথ্যকে বিচার করে না। ফলে সে 'গতি' পায়না, পায় 'স্থিতি। এই সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জ্ঞানের বদলে তাকে জোর দিতে হবে ফার্স্ট-হ্যাণ্ড জ্ঞানের ওপর। নিজস্ব মতের রঙীন চশমা খুলে সাদা চোখে জীবনকে বিচার করতে হবে। এবং এটি করতে হলে প্রথমেই দরকার নিজেকে বিচার করা। একটি ঘটনা দেখে আমি কিভাবে (how) রি-অ্যাকৃট্ করছি এবং কেন (why) এই ভাবে রি-অ্যাকৃট্ করছি—এইটি নিজের মনে বিচার করে দেখলে আমরা বুঝতে পারব আমাদের মনের কণ্ডিশনিং ফ্যাক্টরকে, বুঝতে পারব কিভাবে আমাদের বিশ্বাস ও অভ্যাস আমাদের মনকে চালিত করছে। নিজের মনকে ভাল করে না বুঝলে, নিজের মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ধরতে না পারলে মুক্তমতির পথে এগোন যায় না। এই প্রথম পদক্ষেপটি নিতে পারলে বোঝা যায় মানুষ কিভাবে চালিত হচ্ছে, কিভাবে জিজ্ঞাসার স্থান গ্রহণ করছে ভয় (fear of insecurity) এবং বাসনা (desire for pleasure)। তখনই বুঝতে পারা যায়, অধিকাংশ মানুষই চালিত হয় যুক্তির দ্বারা নয়, সংস্কার (instincts) ও আবেগের (impulses) দ্বারা ; বুঝতে পারা যায় কম মানুষেরই ব্যক্তিত্ব আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-মানুষ mob কিংবা crowd এর অন্তর্গত।

আমাদের শিক্ষায় একটি বিরাট ফাঁক থেকে যাচ্ছে মনোবিজ্ঞান আবশ্যিক না হওয়ায়। কলা ও বিজ্ঞান উভয় শাখার ছাত্ররাই বুঝতে পারছেন যে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মনকে বিশেষ বিশেষ প্যাটার্ণে গড়ে তোলা হচ্ছে। এটি কমিউনিষ্ট, অ-কমিউনিষ্ট দু-ধরণের শিক্ষা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। আর যারা

মনোবিজ্ঞানের ছাত্র, তারাও অন্যের মন-বিশ্লেষণেই আগ্রহী, নিজের মন সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করেনা। গ্রীক দার্শনিকেরা যখন বলেছিলেন, নিজেকে জান (Know thyself) কিংবা ভারতীয় ঋষিরা যে বলেছিলেন আত্মাকে জান (আত্মানং বিদ্ধি)—এর তাৎপর্য এখনও শিক্ষাবিদেরা বুঝে উঠতে পারেননি। ফলে হচ্ছে কী? অধিকাংশ লোকই নিজস্ব কাল্পনিক জগতে বাস করছে। কিছু অভ্যাস, বিশ্বাস, বিশেষ প্রণালীর চিন্তা, ভয় ও বাসনা মানুষকে চালিত করছে। নিজস্ব মানসিক গণ্ডির কারাগারে সে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ বিদ্রোহের লক্ষ্য এই কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নয়, বরং এখানে থেকেই ভালো খাবার, কিংবা রেডিওর বদলে টিভি পাওয়া। প্রকৃত বিদ্রোহ তখনই হবে যখন মানুষ এই কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে।

যে-কোনও ঘটনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়। ধরুন, আফগানিস্তানের ঘটনাটি। এটিকে বিচার করা যায় রুশ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, পাকিস্তানী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এমন কি চীনা-মার্কিন-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও। আবার নাস্তিক-মুসলীম-হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও করা যায়। কিংবা রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি বা সমাজনীতি থেকেও করা যায়। যার মন যে প্যাটার্ণে তৈরী হয়েছে, সে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নেবে। এখন এই প্যাটার্ণ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনভাবে কিভাবে বিচার করা যায়? আগেই বলেছি, পরিবার-জাতি-দেশ-ধর্ম-দল-মত ইত্যাদি আমাদের মনকে কণ্ডিশনড্ করে রেখেছে। অতএব এগুলি থেকে নিজের মনকে মুক্ত করতে হবে। নিজেকে বিশ্ব-নাগরিক ভাবা এবং অসংখ্য জীবের মধ্যে একটি প্রাণী, অর্থাৎ মানুষ বলে ভাবা প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ হলো, মানবিকতার দিক দিয়ে এই ঘটনার তাৎপর্য কি তা বিচার করা। সুদূর অতীত থেকে নিরবিচ্ছন্ন কালপ্রবাহে পৃথিবীতে বহু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যার মধ্যে এটিও একটি ঘটনা। অতএব নিরাসক্ত দৃষ্টি আমাদের নিতে হবেই। বুঝতে হবে, রুশ নেতাদের অবচেতন মনের কোন ইচ্ছেটি আফগানিস্থানে সৈন্য পাঠানোয় তাদের বাধ্য করেছে, বুঝতে হবে আফগান জনসাধারণের মনের প্রতিক্রিয়া কি, সেই সাথে দেখতে হবে মানবিকতার দিক দিয়ে এই ঘটনা পৃথিবীতে কি পরিবর্তন এনেছে। এটি চিন্তা করতে হবে নিজেকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে কল্পনা

করে। চিন্তা করতে হবে এ-ধরনের ঘটনা বিভিন্ন দেশে ঘটতে থাকলে পৃথিবীর চেহারা ভালোর দিকে যাবে, না খারাপের দিকে যাবে। এভাবেই আমরা নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারব, নিরপেক্ষভাবে বুঝতে পারব যে আফগানিস্তান আক্রমণের ঘটনা রাশিয়ার পক্ষে মানবিকতার দিক দিয়ে অপরাধ হয়েছে। লক্ষ্য করতে হবে, অনুরূপ সিদ্ধান্ত চীন-আমেরিকা-পাকিস্তানও নিয়েছে, কিন্তু তারা সিদ্ধান্তে এসেছে স্বীয় স্বার্থানুসারী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যে চীন ভিয়েৎনামে আক্রমণ চালিয়েছে, যে পাকিস্তান বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল, যে আমেরিকা কিউবা-আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল, তাদের পক্ষে আফগানিস্তান-ঘটনার নিন্দা করা হাস্যকর। অনুরূপভাবে আসাম-সমস্যা, মোরদাবাদ-সমস্যাকেও দেখতে হবে মানবিক দিক থেকে। আসামের দাঙ্গা নিন্দনীয়; এর কারণ এই নয় যে বাঙালীর ওপর অত্যাচার চলেছে, এর কারণ ওখানে মানবিকতাকে ধ্বংস করা হচ্ছে।

মানুষের মনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে গভীর যে আকুতি রয়েছে সেটি হলো তার সৃজনী এষণা। ছবি আঁকা থেকে শুরু করে যুদ্ধবিগ্রহ, এমন কি সন্তান ধারণের মধ্যে এই এষণা কাজ করছে—কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও বা পরোক্ষভাবে। এই সৃজনী এষণার পেছনে রয়েছে তার মুক্তিকামী মন। কোথাও মানুষের মন মুক্তি পেতে চাইছে রোদ-ঝড়-বৃষ্টি অন্ধকার থেকে, কোথাও বা দৈনন্দিনের একঘেঁয়ে কর্মপ্রবাহ থেকে। বিজ্ঞান-শিল্প-দর্শন-ধর্ম-সাহিত্য সব কিছুরই মূল প্রেরণা এই মুক্তিকামী মন। একদিকে সে মুক্তি চাইছে বহিঃপ্রকৃতির (external Nature) হাত থেকে, অন্যদিকে সে মুক্তি চাইছে তার অন্তরপ্রকৃতি (mind) থাকে। প্রথমটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান, দ্বিতীয়টি থেকে শিল্প-দর্শন-ধর্ম-সাহিত্য। আসলে, মানুষ তার স্বীয় সসীম সত্তায় সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, সসীম মানুষ অসীম হতে চাইছে, চেষ্টা করছে ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করতে (to transcend the limitation of senses)। চার দেওয়ালের মধ্যেই আমার সমগ্র অস্তিত্ব নিহিত নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ই আমার উপলব্ধির একমাত্র দরজা নয়, এই সাড়ে তিন হাত শরীরটাই আমার একমাত্র সত্তা নয়—এ-কথাই মানুষ তার সৃজনীশক্তির মাধ্যমে বলতে চাইছে, বোঝাতে চাইছে। এভাবেই তার মুক্তিকামী মন নতুন নতুন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ। এই যে মনের স্বাভাবিক গতি অর্থাৎ মুক্তিকামী বৃত্তি, এরই প্রকাশ

তার স্বজনী শক্তিতে—এবং এটি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বারবার। কেন? মা-বাবা শিক্ষক সকলেই চেষ্টা করছেন তাদের সন্তান ও ছাত্রদের মনকে একটা প্যাটার্নে বেঁধে দিতে, কতগুলি বিশ্বাস ও অভ্যাসের ছাঁচে গড়ে তুলতে। এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ যে শুধু ব্যাহত হচ্ছে তা নয়, মানুষের ব্যক্তিত্বও হয় পড়ছে খণ্ডিত। তাই মুক্তিকামী মানুষের প্রধান কাজ হবে নিজেকে 'আবিষ্কার' করা। এই আবিষ্কারের সাথে তার নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে আসবে, সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও কাজ করতে উদ্যোগী হবে। প্রত্যেক মা-বাবা-শিক্ষক-নেতার উচিত ছাত্রদের মনকে স্বাধীন চিন্তা করতে উৎসাহ দেওয়া, যে-মন সাবেক ঐতিহ্য (tradition) ও কর্তৃত্বের (authority) চেয়ে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিকে বেশি সম্মান দেবে। এ-প্রসঙ্গে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা বলি। কয়েকজন সমাজ-সংস্কারক একবার স্বামী বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করেন : স্বামীজী, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মত কি? উত্তরে স্বামীজী বলেন[১] : আমি কি বিধবা যে আমাকে এই প্রশ্ন করছেন! এটি মেয়েদের সমস্যা, এবং আমি চাই মেয়েরাই এ-প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিক। ভারতীয় নারীদের এই যে দুর্দশা তার কারণ তাদের সকল সমস্যায় পুরুষেরা এগিয়ে এসে সমাধান চাপিয়ে দিচ্ছে। পুরুষদের একমাত্র কর্তব্য নারী-শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যাতে মেয়েরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। এ-রকম শিক্ষা পেলে মেয়েরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে। দেশে ক'জন বিধবার বিয়ে হলো তার ওপর দেশের উন্নতি নির্ভর করেনা এর চেয়ে নজর দিন ক'জন মেয়ে স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে তার ওপর। এটাই প্রকৃত উন্নতির লক্ষণ।

শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন[২] : স্কুলগুলিতে গিয়ে দেখি মাষ্টারমশাই কথা বলে যাচ্ছেন, আর ছাত্রেরা চুপ করে আছে। আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক এর বিপরীত—সেখানে শিক্ষক চুপ করে থাকবেন, আর ছাত্ররা কথা বলবে। শিক্ষকের কর্তব্য, ছাত্রদের মনে কৌতুহল জাগিয়ে তোলা; তিনি কতগুলি সমস্যা তুলে ছাত্রদের বলবেন সেগুলি সমাধান করতে।

আগেই বলেছি, জীবন যেন এক বহতা নদী। এর প্রতিটি ঢেউ সুন্দর। এর গতিকে আরও সুন্দর করে তোলা যায় যদি বাঁধনহীন, নিরাসক্ত মন নিয়ে

নিত্য নতুন সৃষ্টিতে একে ভরিয়ে তুলি। শুধু পরীক্ষা পাশ, চাকরী, বিয়ে, অবসর জীবন এবং শেষে মৃত্যু—এটি তো জীবন নয়। এটা স্থিতি (existence) হতে পারে, কিন্তু জীবন (life) নয়। ছকবাঁধা রুটিন-লাইফ, তাসের দেশের নাগরিকের মতো 'চলো নিয়ম মতো,' মামুলী চিন্তা-ভাবনা মানুষের জীবনকে পদে পদে নিষ্পেষিত করে তোলে। তাই শুধু বেঁচে থাকা, দিন যাপনের গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবেই। সৃজনী শক্তিতে ভরিয়ে তুলতে হবে সমগ্র অস্তিত্ব—কারণ জীবনের এটাই একমাত্র তাৎপর্য। রবিঠাকুরের ভাষায়—

জীবনেরে কে রাখিতে পারে,
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে,
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

এইভাবে মননবৃত্তির অনুশীলনে ব্যক্তি মানুষের উদ্বোধন ঘটিয়ে সমাজকে ক্রিয়াশীল করে তুলতে হবে। এবং এভাবেই মানুষের মন থেকে সমস্ত কুসংস্কার দূর হবে।

অশিক্ষা যে এক বিরাট সমাজের বাধা সে-কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল নিরক্ষরতা দূরীকরণে সীমাবদ্ধ রাখলে বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করবে না, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মে মানুষকে উদ্দীপিত করা। শিক্ষার সংজ্ঞা সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন—"মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশই শিক্ষা"।[৩] শিক্ষা সম্বন্ধে অন্যত্র তিনি বলেছেন, "যে শিক্ষার সাহায্যে ইচ্ছাশক্তির (will-power) বেগ (momentum) ও স্ফূর্তি (creativity) নিজের আয়ত্তাধীন হয়, তা-ই যথার্থ শিক্ষা।[৪]···কতগুলি তথ্য, সারাজীবনে যার হজম হলো না, খাপছাড়াভাবে সেগুলি মনের মধ্যে ঘুরতে লাগলো—এর নাম শিক্ষা নয়। যদি কেউ পাঁচটি ভাব হজম করে জীবন ও চরিত্র তদানুযায়ী গঠন করতে পারে, তাহলে সে যে-ব্যক্তি গোটা লাইব্রেরী মুখস্থ করে ফেলেছে, তার চেয়ে বেশী শিক্ষিত।[৫]··· বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ভুলে ভরা। চিন্তা করতে শেখার আগেই মনটা নানা বিষয়ের সংবাদে পূর্ণ হয় ওঠে।[৬]···আমি যাঁর পায়ের নীচে বসে শিক্ষা নিয়েছি এবং যাঁর কয়েকটি ভাবমাত্র শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছি, তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) বহু কষ্টে

নিজের নাম লিখতে পারেন। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে আমি কিন্তু তাঁর মতো আর একজনকেও দেখলাম না। অন্তের চিন্তাধারাকে তিনি কোনদিন নকল করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি নিজেই নিজের বই ছিলেন। আর আমরা সারাজীবন রাম কি বলল, শ্যাম কি বললে না—তাই বলে আসছি, নিজে কিছুই বললাম না। তোমার নিজের কি বলবার আছে বল। পাণ্ডিত্যের মূল্য কি! মনকে বলিষ্ঠ ও নিয়ন্ত্রিত করার মধ্যেই রয়েছে জ্ঞানের একমাত্র মূল্য।[৭]··· অভিজ্ঞতাই একমাত্র শিক্ষক।[৮]··· বেদান্ত বলে—এই মানুষের ভেতরেই সব আছে। একটা ছেলের ভেতরে সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাজ। ছেলেগুলো যাতে নিজের নিজের হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ ব্যবহার করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু করে দিতে হবে। তাহলেই আখেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে। মেলা কতকগুলো কেতাবপত্র মুখস্থ করিয়ে মনিষ্যিগুলির মুণ্ডু বিগড়ে দিচ্ছিস। বাপ্! কি পাসের ধুম, আর দুদিন পরেই সব ঠাণ্ডা! এমন উচ্চশিক্ষা থাকলেই কি, আর গেলেই বা কি?"[৯]

শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে জনসাধারণকে শোষণ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। শোষণ যে কেবল অর্থনৈতিক নয়, এর চার রকম চেহারা আছে, সে-কথা আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে কিভাবে বর্তমান সমাজে এই চার রকমের শোষণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে চলেছে। শোষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার সাথে সাথে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে বিপ্লবীদের। আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ মানুষ তখন নিজেরাই এগিয়ে আসবে শোষণের নিরাকরণে।

সামাজিক অভিশাপগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সাথে সাথে বিরোধী গোষ্ঠীগুলির প্রতিও সতর্ক নজর রাখতে হবে। পুরোহিত সম্প্রদায় বলতে শুধু হিন্দু সমাজের পূজারী বামুনকে বোঝায় না, পাদ্রী-পুরোহিত-মৌলবীদেরও বোঝায় এবং সেই সাথে আধুনিক 'বাবা'রাও এর অন্তর্গত। হিন্দু সমাজের বড় অভিশাপ জাতিভেদ প্রথা টিকিয়ে রাখছে পুরোহিতেরা। জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, জাতিভেদ একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া

কিছুই নহে। উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারত-গগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে যদি লোকের হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি (lost individuality) ফিরাইয়া আনা যায়।"[১০]মহাভারত ও ভাগবতে আছে যে সত্যযুগে জাতিভেদ ছিল না, ছান্দোগ্য উপনিষদে একজন শূদ্রকে বেদান্ত-আলোচনা করতে দেখা যায়, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগত জাতিভেদ সমর্থন না করে 'গুণ কর্মবিভাগশঃ অর্থাৎ গুণ ও কর্মের ওপর জোর দিয়েছেন। এ রকম বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে স্বামীজী দেখিয়েছেন যে জাতিভেদ হিন্দু ধর্মের অঙ্গ নয়, এটি একটি সামাজিক প্রথা, এবং বর্তমানে এর দূরীকরণ প্রয়োজন। তাঁব কাছে ব্রাহ্মণত্ব একটি আদর্শ-যে আদর্শে সবাইকে তুলে নিতে হবে। বেলুড় মাঠের এক অনুষ্ঠানে তিনি ৪০-৫০ জন অব্রাহ্মণকে গায়ত্রী মন্ত্র ও উপবীত দিয়ে সেই কাজের সূচনা করে গিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে তথাকথিত শূদ্র এমন-কি আদিবাসী-উপজাতি গোষ্ঠীর লোককে পুজো করতে দেখা যায়। হিন্দু পুরোহিতদের সাথে সাথে মুসলমান মৌলবী এবং খৃষ্টান পাদ্রীরাও পরিবার-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রচাব করে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলছে এবং সেই সাথে ধর্মের সাথে রাজনীতিব মিশ্রণ ঘটিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা অগ্নিগর্ভ করে তুলছে। আব মৌলবীরা বহুবিবাহ প্রথা ও তালাক প্রথাকে সমর্থক করে মুসলমান সমাজকে ইতিহাসের বিরুদ্ধে নিযে যাচ্ছে। এইভাবে পাদ্রী-পুরোহিত-মৌলবীদের অধিকাংশই আজ কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি হয়ে সমাজের পক্ষে আপদ বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ, তা সে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান যাই হোক না কেন, অসহায়ের মতো এদের অত্যাচারে নিষ্পেষিত। এ-অবস্থাব দূরীকরণ সম্ভব হবে, স্বামীজীর ভাষায় মানুষকে তার 'হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্রবুদ্ধি' ফিরিয়ে দিলে। পাদ্রী-পুরোহিত-মৌলবীদের পাল্লায় পড়ে মানুষ নিজের নিজের বিবেক ও বিচার হারিয়েছে, সেই সাথে হারিয়েছে নিজস্ব সামাজিক ব্যক্তিত্ব। নিজস্ব বিবেক, বিচার, এবং ব্যক্তিত্বকে পুনর্গঠন করতে পারলেই সাধারণ মানুষ এদের হাত থেকে মুক্ত হবে। এর সাথে সাথে আধুনিক 'বাবা'দের সম্পর্কেও সতর্ক হতে হবে। রোমান্টিক ধর্মের অলৌকিকতা এবং অন্ধ গুরুবাদের পরিবর্তে মানুষ যাতে বিশুদ্ধ ধর্মকে বুঝতে

পারে, সে-কাজ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'রাজযোগ' বইয়ে লিখেছেন, "ইতিহাসের প্রারম্ভ হতে মানুষের সমাজে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানেও যে-সব সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণালোকে রয়েছে, তাদের মধ্যেও এ-রকম ঘটনার সাক্ষী মানুষের অভাব নেই। এগুলির অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ যাদের কাছ থেকে এইসব শোনা যায় তাদের অনেকেই অজ্ঞ, কুসংস্কারচ্ছন্ন বা প্রতারক।··· অতিপ্রকৃতি (Super-natural) বলে কিছু নেই, তবে প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম বিভিন্ন প্রকাশ বা রূপ আছে। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য। স্থূলকে সহজেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, সূক্ষ্মকে সে-রকম করা যায় না। রাজযোগ অভ্যাস করলে মানুষ সূক্ষ্মতর অনুভূতি অর্জন করতে পারে।"[১১] কারোর যদি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা থাকে, তবে সমাজের স্বার্থেই তাদের এগিয়ে আসা উচিত, যাতে এগুলি নিয়ে গবেষণা করে মানুষ নতুন জ্ঞান অর্জন করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করার কথা বলতেন, তিনি নিজে এই দুটিকে জয় করতে পেরেছেন কি-না এ-বিষয়ে বিভিন্ন লোক তাঁকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। টাকা ছুঁলে তাঁর হাত সঙ্কুচিত হয় কি-না এ-সম্বন্ধে তরুণ নরেন্দ্রনাথ তাঁকে পরীক্ষা করেছেন, তিনি কাম জয় করতে পেরেছেন কি-না তা নিয়ে জমিদার মথুরানাথ ও তরুণ যোগীন্দ্র (পরে স্বামী যোগানন্দ) তাঁকে পরীক্ষা করেছেন, সমাধিতে হার্টবীট্ বন্ধ হয় কি-না এবং চোখের রিফ্লেক্স কাজ করে কি-না সে-বিষয়ে তাঁকে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পরীক্ষা করেছেন, সম্মোহন শক্তি প্রয়োগ করে তরুণ নিরঞ্জন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পরীক্ষা করে দেখেছেন তাঁর মনের শক্তি অসাধারণ কি-না। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বিভিন্ন লোক নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন এবং তিনিও সানন্দে এই সব পরীক্ষায় নামতে রাজি হয়ে তাদের উৎসাহ দিয়েছেন এই বলে—"এই তো চাই। অন্ধভাবে কিছু মেনে নিবিনা। যাচাই করবি, বিচার করবি, তবে বিশ্বাস করবি। না বুঝে গ্রহণ করা কপটতারই সামিল !" বর্তমান সমাজে দু-ধরণের গুরুকে আমরা দেখতে পাই—একদল যারা শিষ্যকে প্রতি পদে পরাধীন করে রাখেন এবং এইভাবে কর্তাভজা-মার্কা সম্প্রদায় গঠন করেন ; অন্যদল গুরু যারা শিষ্যদের স্বাধীনতা দেন, বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগে উৎসাহ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিনী মা সারদা বলতেন—"উচিত কথা

গুরুকেও বলা যায়, তাতে পাপ হয় না।[১২]...জাগতিক কাজে নিজের বিচার-বুদ্ধিকেই অবলম্বন করবে, এমন-কি তা যদি গুরু-নির্দেশের বিরোধী হয় তবুও।"[১৩]

বিশুদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় না করে মানুষ ধর্মের নামে কিভাবে কুসংস্কার, অর্থহীন আচার ও অন্ধবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে তা বর্তমান সমাজে আমরা দেখতে পাই। সেই সাথে পাদ্রী-পুরোহিত-মৌলবীরা নিজেদের ধর্মকে একমাত্র সত্যধর্ম বলে প্রচার করে সাম্প্রদায়িকতাকেও আশ্রয় দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার ধর্মমতই জগতের কাম্য, তাঁর নীতিই পারবে আজকের সমাজে সব রকম সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ করে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের জাগরণ ঘটাতে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "ভগবানের নামে এত গণ্ডগোল, যুদ্ধ ও বাদানুবাদ কেন? · কারণ সাধারণ মানুষ ধর্মের মূলে যায়নি। তারা তাদেব পূর্ব-পুরুষদের কতগুলি আচার নিয়ে সন্তুষ্ট। তারা চায় অন্য লোকেরাও সেই আচারগুলি গ্রহণ করুক।[১৪] · ধর্মের মূল লক্ষ্য হলো কাল্পনিক ও ভয়ানক বৈষম্যকে একেবারে নাশ করে ফেলা।"[১৫]

ব্যবসায়ী শ্রেণীও বিপ্লবীদের বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে, কারণ এই নতুন সমাজদর্শনে ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিলুপ্তি কথা বলা হয়েছে। আমরা আগে দেখেছি, স্বামীজীর মতে ভারী ও বড শিল্প সরকারের হাতে থাকা উচিত এবং এই শিল্পগুলির পাশে যে-সব অ্যালায়েড ক্ষুদ্র শিল্প গডে উঠবে সেগুলি পরিচালিত হবে সমবায় প্রথায় বেসরকারীভাবে। আমরা এও দেখেছি যে পণ্য কেনা-বেচায় মুখ্য ভূমিকা নেবে গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি, এতে ব্যবসায় স্বাধীন মিডলম্যানদের অস্তিত্ব লুপ্ত হবে। এ ধরণের পরিকল্পনায বড় ব্যবসায়ীরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হবে। ছোট ব্যবসায়ীরা কিন্তু এর বিরোধী বিশেষ হবে না, কারণ বর্তমানে বড় ব্যবসায়ীদের চাপে এদের অবস্থা খুবই খারাপ। ব্যবসায়ীদের সাথে বিপ্লবীরা কি আচরণ করবে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। জনসাধারণকে উৎসাহিত করে অসংখ্য সমবায় সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। নতুন সমাজব্যবস্থা স্থাপিত হবার আগে এইগুলি ব্যবসায়ীদের অত্যাচার বেশ কিছুটা কমিয়ে আনবে, আর পরবর্তীকালে অর্থাৎ নতুন সমাজব্যবস্থা গঠিত হলে এগুলিকে তুলে দিতে হবে গ্রাম-পঞ্চায়েত ও নাগরিক সভার হাতে। বর্তমানে সমবায় সংস্থাগুলি আশানুরূপ কাজ করছে

পারছে না, কারণ আদর্শবাদী লোকেরা এ সবের পরিচালনা থেকে সরে যাচ্ছে। বিপ্লবীদের এদিকে নজর দিতে হবে।

কিছু কিছু রাজনৈতিক দল এই নতুন সমাজব্যবস্থার বিরোধী হবেই। দক্ষিণপন্থী দলগুলি চাইবে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখতে, এরা চাইবে জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের মতলব হাসিল করতে, নির্বাচনে ২।৪ টা সীটের জন্য আদর্শবিরোধী নানান জোটে সামিল হতে। বিপরীত দিকে, বামপন্থী দলগুলিও চাইবে যতদিন পারা যায় এই পচা গলা সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে, কারণ দুর্নীতি ও অপশাসনে বিরক্ত মানুষ তখন স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের দিকে ঝুঁকবে এবং এভাবেই বামপন্থীরা দেশের 'চিরস্থায়ী নেতৃত্ব' দখল করবে। সকল বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত বামপন্থীরা রক্ষণশীল সরকারের সাথে প্রেম ও ঘৃণার সম্পর্ক রাখতে চায়, আদর্শবাদী বিপ্লবীদের চেয়ে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের তারা বেশী পছন্দ করে, পুঁজিবাদীদের সাথে তারা ঘনিষ্ঠতা রাখে স্বীয় স্বার্থেই। তারা চায় না মানুষ পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদের বিকল্প খুঁজুক। তারা সর্বহারার দোহাই দেয়, কারণ তারা জানে যে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র তাদের দলের একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হবেই। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলগুলি তাই স্বাভাবিকভাবেই এই নতুন সমাজদর্শনের বিরোধী হবে। তাছাড়া এদের উভয়ের কাছে আছে টাকার থলি, বিশাল প্রচার সংগঠন, কমিটেড সমর্থকের বাহিনী। নতুন বিপ্লবীদের দমন করতে এরা ন্যায়-অন্যায় কোন পথের আশ্রয় নিতেই দ্বিধাবোধ করবে না। এদের আক্রমণের মোকাবিলা করতে হলে বিপ্লবীদের উচিত হবে আরও বেশি করে জনসাধারণের সাথে মিশে যাওয়া। গণচেতনার প্রসার যত বেশি হবে, গণ সংগঠনের ভিতও তত মজবুত হবে। তাছাড়া 'পাইয়ে দেবার রাজনীতি' করে করে দক্ষিণপন্থী বামপন্থী দলগুলি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে, এ বিষয়টি সম্যক প্রচারের সাহায্যে এদের সমর্থকদেরও ঐসব দল থেকে বের করে নিয়ে এসে নব চেতনায় বিশ্বাসী করে তোলা সম্ভব হবে। পুঁজিবাদী ও বামপন্থী নেতাদের কপট চরিত্র ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠেছে জনগণের কাছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও বামপন্থী রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকালেই এটি দেখা যায়। পুঁজিবাদীদের ধ্বংসের বীজ যেমন তার মধ্যেই রয়েছে, তথাকথিত সাম্যবাদের

'ধ্বংসের বীজ তেমনি রয়েছে বামপন্থী দেশগুলিতে। ক্রমাগত অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্য দিয়েই এরা নিজেদের গদী ধরে রাখে, আবার এই অত্যাচার নিপীড়নই তাদের মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে। জার্মানী-পাকিস্থান-ভারত-আমেরিকা--রাশিয়া--চীন--কম্বোডিয়া--পোল্যাণ্ড--চেকোশ্লাভাকিয়া--হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীতে এটি সুস্পষ্ট। নতুন বিপ্লবীদের তাই ভয় করার কিছু নেই, কারণ স্বাভাবিকভাবেই এই দুই ধরণের নেতারা অপসারিত হবে।

মানুষ পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদের বিকল্প চাইবে। মনে রাখতে হবে জনসাধারণই মূল শক্তির উৎস। তাই শক্তি উৎসের যত কাছাকাছি যাওয়া যাবে, এই শক্তি উৎসের ওপর যত বেশি নির্ভর করা যাবে, নতুন বিপ্লবীরা ততই দুর্জয় হয়ে উঠবে। জাগ্রত জনমতের কাছে বহু রাজার মুকুট উড়ে গেছে, সেনাপতির তরবারি খসে পড়েছে, রাজনৈতিক নেতার শোচনীয় পরাভব ঘটেছে। অতীতে যা হয়েছে, বর্তমানে যা হচ্ছে, ভবিষ্যতেও তাই হবে। স্বামীজী তাই বলেছেন, "সংগ্রাম, সংগ্রাম—যতক্ষণ না আলো দেখছ, ততক্ষণ সংগ্রাম। এগিয়ে যাও। যুদ্ধে যদি লক্ষ লক্ষ লোকের পতন হয় তাতেই বা ক্ষতি কি, যদি জয়ী হয়ে দু'একজনও ফিরে আসে। যে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হলো তারা ধন্য, কারণ তাদের রক্তমূলেই জয় হয়েছে। বড়-লোক তাঁরাই যারা নিজের বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন, একজন নিজের শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার হাজার লোক তার ওপর দিয়ে নদী পার হয়।[১৬] আমরা সিদ্ধিলাভ করবোই করবো। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণ দেবে, আবার শত শত লোক উঠবে। চাই অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। কাপুরুষ ও মুর্খেরাই অদৃষ্টের দোহাই দেয়, বীরপুরুষেরা মাথা উঁচু করে বলে—আমাদের অদৃষ্ট আমরাই গড়ব। মৃত্যুকে উপাসনা করতে সাহস পায় কজন? এসো, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি, ভীষণকে ভীষণ জেনেই আলিঙ্গন করি। যত দিন যাচ্ছে ততই দেখছি, সব কিছু আছে পৌরুষের মধ্যে। এই আমার নতুন বার্তা। বলবানকে দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে দেখলে অবিলম্বে সেই বলবানকে চূর্ণ করে ফেলবে। মনে রেখ, বিদ্রোহে তোমার চির অধিকার।"[১৭]

সহায়ক উৎস

১ম অধ্যায়

১। ২য় অধ্যায়ে 'বিবেকানন্দের বক্তব্য' দ্রষ্টব্য
২। পত্রাবলী, ১ : ১৭৪
৩। ঐ ২ : ২৫৭
৪। বাণী ও রচনা ৬ : ২২৩-৪
৫। ঐ ৯ : ১৯৫-৯
৬। ঐ ৩ : ৩৫২
৭। ঐ ৬ : ৩৯২ ; পত্রাবলী ২ : ৪৫০
৮। পত্রাবলী ২ : ৩৪২
৯। বাণী ও রচনা ৩ : ৩৪৫-৬
১০। Selec'ed Works 1 : 591
১১। বাণী ও রচনা ৬ : ১৫০, ১৫৮-৯
১২। ঐ ৬ : ২০২-৪
১৩। ঐ ৬ : ২০৩
১৪। ঐ ৬ : ২৪৩
১৫। ঐ ৬ : ২০৬
১৬। ঐ ৫ : ৩৯৪
১৭। ঐ ৬ : ২২৩
১৮। ঐ ৬ : ২৪২-৩
১৯। ঐ ৬ : ২৩৫

২য় অধ্যায়

১। পত্রাবলী ২ : ২৯৩
২। বাণী ও রচনা ৩ : ১২০
৩। ঐ ১ : ২১৯
৪। ঐ ৯ : ১২০
৫। ঐ ১ : ১২০
৬। ঐ ৬ : ১৬০
৭। ঐ ৬ : ১৬১
৮। ঐ ৬ : ২৪৩
৯। ঐ ৬ : ২০৪
১০। ঐ ৯ : ২৩৬
১১। ঐ ১০ : ২১৫
১২। ঐ ১০ : ২৩৭
১৩। ঐ ৩ : ৩৪৬-৭
১৪। পত্রাবলী ২ : ১৬৩-৪
১৫। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ৭১২-৩
১৬। পত্রাবলী ১ : ১৬০-২
১৭। বাণী ও রচনা ৩ : ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৪৯-৫০
১৮। ঐ ১ : ১০৭ ; পত্রাবলী ২ : ১৬২, ২৪৫
১৯। বাণী ও রচনা ২ : ২৬০
২০। ঐ ২ : ১৯৯
২১। ঐ ২ : ১৯১
২২। ঐ ২ : ১৮৭
২৩। চিঠি—১. ১১. ১৮৯৬
২৪। বাণী ও রচনা ৯ : ১২

৩য় অধ্যায়

১। ১ম অধ্যায়ে 'শোষণের প্রকার-ভেদ' দ্রষ্টব্য
২। সমকালীন ৩ : ৪৭৯
৩। পত্রাবলী ২ : ৪৯
৪। বাণী ও রচনা ৮ : ২৪
৫। ঐ ৬ : ৩২
৬। ঐ ৬ : ২৫৩

৭। বাণী ও রচনা ৬ : ১৬১-২
৮। ঐ ৫ : ৫১
৯। পত্রাবলী ২ :৪৪৮-৯
১০। ঐ ২ : ২৪৯-৫০
১১। বাণী ও রচনা ৩ : ৩৫১
১২। পত্রাবলী ১ : ৩৭৩
১৩। বাণী ও রচনা ৫ : ১৩৭-৮
১৪। ঐ ১ : ১৬০
১৫। ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ৪৫৮
১৬। বাণী ও রচনা ৬ : ২৪২
১৭। ঐ ৫ : ১০৫
১৮। ঐ ৯ : ৪২৬, ৪৭৯
১৯। রেমিনিসেন্সেস, পৃঃ ২২৬-৭
২০। পত্রাবলী ১ : ২৫৬ ; বাণী ও রচনা ৯ : ৪৬৯
২১। বাণী ও রচনা ৯ : ৪০৭-৮
২২। ঐ ৯ : ১৮৭

৪র্থ অধ্যায়

১। বাণী ও রচনা ৬ : ৪০১
২। ঐ ২ : ২১৬
৩। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পূর্বোক্ত
৪। পত্রাবলী
৫। বাণী ও রচনা ৮ : ২৪
৬। ঐ ৬ : ২২৩-৪
৭। ঐ ৬ : ১৫৬-৭
৮। ঐ ৬ : ৪০১
৯। ঐ ২ : ২১৬
১০। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৫৫
১১। পত্রাবলী ২ : ২৫৯
১২। ঐ ২ : ৩১২
১৩। বাণী ও রচনা ৫ : ৩৪২
১৪। ঐ ১ : ৯৬-১০৭
১৫। পত্রাবলী ২ : ৪৫১-২

৫ম অধ্যায়

১। পত্রাবলী ২ : ৪৫০ ; বাণী ও রচনা ৫ : ৭০, ৬ : ৩৯২, ৯ : ৪৪২
২। বাণী ও রচনা ৫ : ১০৪
৩। জনগণের অধিকার, পৃঃ ৫২
৪। পত্রাবলী ২ : ২৫৭
৫। ঐ ১ : ১৮২-৩
৬। বাণী ও রচনা ২ : ৩৭৩

৬ষ্ঠ অধ্যায়

১। জনগণের অধিকার, পৃঃ ৫১
২। বাণী ও রচনা ৫ : ৩৫৫
৩। জনগণের অধিকার, পৃঃ ৫১
৪। বাণী ও রচনা ৬ : ৮১

৭ম অধ্যায়

১। যুগবাণী, শারদীয়া ১৩৮৪, পৃঃ ৫৪
২। শিক্ষাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ১৫৬
৩। পত্রাবলী ১ : ১৪২
৪। কমপ্লিট ওর্কয়স ৪ : ৪৯০
৫। জনগণের অধিকার, পৃঃ ৩৬
৬। ঐ
৭। বাণী ও রচনা ১ : ২৮০
৮। ঐ ৯ : ৪০২
৯। ঐ
১০। ঐ ৬ : ৩৮৪
১১। ঐ ১ : ২০৭
১২। শ্রীশ্রীমায়ের কথা ১ : ১৭
১৩। শ্রীসারদাদেবী (ইংরেজি বই), পৃঃ ১৩০-১
১৪। বাণী ও রচনা ১ : ২১৩, ৬ : ৩৪০-১, ৩৫২
১৫। জনগণের অধিকার, পৃঃ ৫৬
১৬। ঐ পৃঃ ৪৪
১৭। ঐ, পৃঃ ৪৫-৪৮